কিত করে তুলছিল সে-যে শরমেরই একটা আলোড়ন তার চোখে-মুখে
-ভাব গোপন ছিল না।

কটক পার হয়েও কিছু পথ লতাগুল্মের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।
শস্ত পথ ঘাসে বুজে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, স্থানে স্থানে ধ্বংসপ্রায়
কেয়ারির চিহ্ন বিদ্যমান। পথ আর যখন বাকি নেই এমন সময় সেই
নিস্তব্ধ উদ্যানে মনে হোল কে যেন অতি ধীর-পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।
মমতা বিস্মিত হয়ে থামল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই—কেবল ঝাউগাছ-
গুলির শোঁ-শোঁ একটানা দীর্ঘশ্বাস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এ-পুরীতে খোদ মালিক ভিন্ন আর প্রাণী বলতে ছিল চাকর সনাতন
ও পাচক লোচন। তাদের দ্বারা এমন মৃদু পদক্ষেপ সম্ভব বলে মনে
হোল না।

সম্মুখে কামিনীগাছের ঝোপ ছিল একটা, সেটাকে অতিক্রম করলে
[illegible] মমতা চমকিতে
হয়ে গেল—একটি [illegible], মাথার চুল
[illegible] আবক্ষ দাড়ির প্রতিটি [illegible] সাদা [illegible], সাদা
[illegible], সাদা [illegible]। একস্থানে স্থির হয়ে থাকলে [illegible] কোন
[illegible]-মূর্তি ভিন্ন তাঁকে [illegible] চলত না, কিন্তু অতি-বৃদ্ধেরা [illegible]
[illegible] যেমন একপ্রকার যন্ত্রচালিতের মতো [illegible] চলেন বৃদ্ধও
মাটির দিকে চেয়ে তেমনই ধীর-পদক্ষেপে ঠুক্‌ঠুক্ করে এগিয়ে
আসছিলেন।

মমতা আত্মসংবরণ করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল এবং প্রণাম করে
পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—'আপনি! কাশী থেকে কবে এলেন?'

বৃদ্ধ তার বিস্মিত মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে স্নিগ্ধ হেসে
বললেন—'কেন, আমি তো প্রতি বছরেই এ-সময়ে কিছুদিন এসে থাকি।

একটু থেমে বললেন—'দু'দিন এসেছি। ভাল আছ সব?' তাঁর প্রতিটি শব্দ যেমন শান্ত তেমন আশ্চর্যরকম স্পষ্ট। এতটা বয়স হয়েছে একটা দাঁত পড়েনি, চোখের জ্যোতি এতটুকু ম্লান হয়নি।

মমতা স-সম্ভ্রমে মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

বৃদ্ধ বললেন—'তোমার মা, মামা ওরা ভাল আছেন? তুমি আশ্রমের কাজ করছ?'

মমতা এবারও তেমনই মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ। তারপর বৃদ্ধ চলতে লাগলে সে-ও দু'চার পা অনুসরণ করে জিজ্ঞাসা করল—'এখন বাড়ি ফিরছেন?'

'হ্যাঁ। ভাস্করের কাছে এসেছিলাম।' বলে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—'কিন্তু কাজ নষ্ট করে তুমি ফিরছ কেন? সে তো উচিত নয়!' বৃদ্ধের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে কোথাও এতটুকু কাঠিন্য ছিল না তবু তাকে যেন না মেনে চলে না। মমতাকে ফিরতে হোল।

বৃদ্ধ চলে গেলেন, মমতার মুখের উপর সম্ভ্রমের ছোপ তখনও লেগে রইল। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু অন্যমনাও হয়েছিল—অকস্মাৎ সজাগ হোল এ-গৃহের পাচক লোচনের সবিস্ময় দৃষ্টিপাতে। কিছু দূরে এক টুকরো কোপান জমির উপর গৃহস্বামীর নিয়মিত শরীর-চর্চার উপকরণ জড়ো করা ছিল, তারই একটায় বসে এবং অপর একটায় পা রেখে সে বিস্ফারিত চোখে নির্বাক হয়ে ছিল। লোচন সদ্য গ্রামাগত, বুদ্ধি-বৃত্তিও অত্যন্ত মোটা রকমের কিন্তু তার গোলাকৃতি বড় বড় দুটো চোখ স্পষ্ট বলছিল যে এ-গৃহে সামান্যিক কাজে নিযুক্ত হলেও 'দিদিমণি'র বেশবাসের এমন পারিপাট্য পূর্বে দেখেনি।

মমতা চকিত হয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু লোচনচন্দ্র বোধ হয় এক নিমেষে ভেবে নিল যে হাতের সদ্য-তোলা ফুলগুলো আজ নিজের তৈরি

পিচ্ছিল কর্ণপ্রান্তের চেয়ে অমন সুন্দর শাড়িপরা দিদিমণিকে [illegible] ভাল মানাবে, তৎক্ষণাৎ এগিয়ে ধরে হাসতে লাগল—'নাও দিদিমণি!'

মমতা ফুল নিল, কিন্তু লোচনের মুগ্ধবিস্ময়ের হেতুও তার কাছে গোপন থাকল না। দেখতে সে অতিশয় সুরূপা হলেও বেশবাসে পারিপাট্য আনতে লজ্জা পেত। ফুল নিয়ে যেতে যেতে বলল—'তোমার দাদাবাবু তো হলঘরেই আছেন।'

হলের দুয়ারে পৌঁছলে মমতার মুখে হাসি খেলে গেল, হাতের ফুলদুটো খোঁপায় গুঁজে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

প্রাচীন ধরনের প্রশস্ত কুঠরি, জানলা-দরজা কম বলে ভিতরে আলো যথেষ্ট নয়। চার দেয়াল জুড়ে মোটা ফ্রেমে অতীত-পুরুষদের তৈলচিত্র ঝুলছে, মাঝে মাঝে হরিণের শিঙ, ঢাল-বর্শা, বরগা থেকে গোটাকত ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে—কাপড় দিয়ে মোড়া। পূর্বে কক্ষটির যে-চলনই থাক বর্তমান গৃহস্বামীর প্রয়োজনে এখন স্টুডিয়ো সাজতে হয়েছিল—ঘরময় সমাপ্ত অসমাপ্ত সংগৃহীত নানা প্রকারের মূর্তি।

মূর্তিকারও স্বয়ং এক কোণে মগ্ন হয়ে বসে। জানলার ধারে টেবিল ও গোটাকত পিঠ উঁচু চেয়ার, তারই একটাতে বসে ভাস্কর ভাবনায় এমন স্তব্ধ হয়ে ছিল যে মমতার প্রবেশ প্রথমে লক্ষ্য করেনি, শেষে একটু চকিত হয়ে নড়ে বলল—'এস।'

মমতা একটা টুল নিয়ে বসল।

কিন্তু তার মুখের উপর থেকে ভাস্কর দৃষ্টি ফিরায়নি, একটুক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে নিঃশব্দে বলল—'বাঃ! কিন্তু ঠিক আশ্রম-কন্যার মতো দেখাচ্ছে না-যে!'

মমতার গালের উপর [illegible] লজ্জার রক্ত খেলে গেল। এই একটি লোক ভিন্ন অন্য কারও মুখ থেকে এ কথা শুনলে সে মরমে মরে যেত।

ভাস্কর আসন থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল, বলল—'আশীর্বাদ করে গেলেন—বঙ্কিমের সেই যে মূর্তি গড়েছিলাম!' তারপর খোলা জানলাটার দিকে এগোতে এগোতে বলল—'আজ অনেকক্ষণ ছিলেন, আস্তে আস্তে একটি একটি করে অনেক কথা বললেন—এমন বলেন না। বলছিলেন—দেশের যেদিন দুদিন, দুঃখ-গ্লানির যেদিন শেষ ছিল না—বঙ্কিম মন্ত্র দিয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম্'। মন্ত্রে ভুল ছিল না—তাই কর্মী এল, সংগ্রাম এল, সিদ্ধিও এল, এতটা দিন এগিয়ে এসেছি সেই আগুনের জোরেই। কিন্তু—।' বলতে গিয়ে থেমে থেকে ভাস্কর বাইরের দিকে চেয়ে রইল। জানলা দিয়ে দেখা যায়—ভাঙা দালান আর ইট-পাথরের স্তূপ, কড়ি-বরগাও হাড়-পাঁজরের মতো উপুড় হয়ে পড়ে। লতাপাতায় ঢেকে ফেলছে সব।

মমতা একাগ্রমনে শুনছিল, বলল—'কিন্তু কি?'

ভাস্কর ফিরে দাঁড়াল—'কিন্তু কি বলে গেলেন জানো? বললেন—এই জোলো হাওয়া আর পলিমাটির পরে কোন ইমারতই তো অনেকদিন আশ্রয় দেয় না, সংগ্রামের কোন মূর্তিই চিরস্থায়ী নয়। তাই অনেক আমরা গড়েছি তবু আমাদের মতো নিঃস্বও কেউ নেই। আবার নতুন করে গড়তে হবে।'

মমতা নীরব হয়ে চেয়ে রইল।

ভাস্কর সেই জানলা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল, বলতে লাগল—'চারদিকে আবার দুঃখ, দুর্দশা, গ্লানি—ভেঙে পড়ছে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সব, আজ নতুন চিন্তা চাই, নতুন মন্ত্র চাই, নতুন মূর্তি চাই। বললেন—যে-মাটিতে বন্দে-মাতরমের জন্ম হয়েছিল সেই মাটিই আবার ফসল দেবে। যে-মাটিতে বঙ্কিম গড়েছিলাম সেই মাটিতেই নতুন কালের রূপ গড়তে হবে। আজ তারই ফরমাজ দিয়ে গেলেন।'

মমতার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পিছন থেকে বক্তাকে প্রণাম জানিয়ে দিচ্ছিল কিন্তু সে নিজের অন্তর-আবেগে কথা বলছিল, তেমনই বলতে লাগল—'এবার আর শুধু দেশ 'মা' নয়, কেবলই আত্মোৎসর্গও নয়—সে-দিন ছিল দেশের ছেলেবেলা। এবার বয়স হয়েছে দেশের—সংগ্রামেরও, তাই সকল শ্রেণী সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেনা-পাওনার দায়িত্বেরও হিসেব মিলোতে হবে। নতুন মূর্তি হবে পৌরুষের-পুরুষ মূর্তি—সে মূর্তিতে মৈত্রী স্বাধীনতার সূত্র থাকা চাই।'

সে থামলে মমতার মুখের উপর উল্লাসের হাসি ফুটে উঠল, বলল—'অভ্রান্ত ওঁর দৃষ্টি। তাই ঠিক কাজে ঠিক লোককে বেছে নিয়েছেন!'

ভাস্কর চকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

মমতা টুল ছেড়ে এগিয়ে গেল, বলল—'হ্যাঁ। অমন পুণ্যের মূর্তি তো আর নেই। তাছাড়া ঐ চলার সূত্রকে খুঁজে দেবার কাজ চিরকালই শিল্পীর, কবির, দার্শনিকের। তাঁরা আনন্দে করেও এসেছেন।'

'কিন্তু কি আমার সাধ্য সে তো বুঝে পাইনে।'

'তবু এই সাধ এসেছে কত বড় মন থেকে সে তো বুঝছেন?' বলতে বলতে মমতার কণ্ঠে অপরিসীম শ্রদ্ধা ফুটে উঠল—'উমানাথ! কেন জানিনে ওঁকে দেখলেই আমার ভোরের তুষার-ধবল হিমালয়ের কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলায় দার্জিলিং থেকে দেখতাম। তারই সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি যেন নতুন দিনের প্রথম আলো দেখতে পেয়ে প্রিয় শিষ্যকে জানিয়ে রেখে গেলেন!'

ভাস্কর তথাপি চুপ করে থাকল।

মমতা হাসল—'থাক, অতো আর গম্ভীর হতে হয় না। চলুন, এখনই তো কাজে বসছেন না।' বলে দেয়ালের হরিণের শিঙে ঝোলানো

জামা এনে এগিয়ে দিল বৃদ্ধ—'আমি হলে আগে কিন্তু আপনার জন্যে অন্য বিধান দিতাম—প্রচুর আলো প্রচুর হাওয়া আর নিয়ম মেনে খাওয়া। নিন।'

ভাস্কর হাত পেতে জামা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল, মমতা বলল—'মেলায়'।

ভাস্কর দ্বিরুক্তি করল না। মমতার সাথে দ্বিরুক্তি করে তার জয়লাভের উদাহরণ খুব বেশীও ছিল না।

অট্টালিকার সমান দীর্ঘ পুরানো আমলের একটানা থাম-সাজান বারান্দা। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে ছাদের নীচে রোদের আলো কমে আসছিল। থামের মাথাগুলি থেকে অসংখ্য পায়রা কুলের গম্ভীর কূজন ভিন্ন আর কোন শব্দ বড় শোনা যায় না। দু'জনে নিঃশব্দেই বারান্দার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল।

বাড়ির সারা গায়ে ক্ষয় ধরেছিল, অথচ মনিব থাকেন মূর্তিগড়া নিয়ে। সনাতন নিজেই অনেক চেষ্টায় সেকালের জরাজীর্ণ দেয়ালের গায়ে একালের চকচকে খানকত জানলা-দরজা লাগিয়ে নিয়েছিল। ছাদ থেকে ভিত পর্যন্ত বাড়িময় সনাতনের এমন প্রয়াসের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান।

অতি-পুরানো চাকরের এই বুক দিয়ে বান ঠেকাবার বিচিত্র চেষ্টা দেখে একই সঙ্গে হাসি ও কান্না ভিড় করে আসে।

বৃদ্ধ নিজে কর্নিক নিয়ে একটা থামের দীর্ঘ ফাটলে সিমেন্ট লাগাচ্ছিল এবং সেই অসাধ্য সাধনে অপারক হয়ে দূরে থেকে দক্ষ স্থপতির মতো চিন্তাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। ওদের অদূরে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে একটু কুণ্ঠিত হেসে জিজ্ঞাসা করল—'বেড়াতে

মমতা বলল—'হ্যাঁ সনাতন।'

'আচ্ছা যাও। কিন্তু দেখ যেন বেশি দেরি করিয়ে দিও না—ঝড়-ঝাপ্‌টার কাল।'

তারপর ওদের সকৌতুক মুখের দিকে দৃষ্টি পড়লে বৃদ্ধ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে লাগল—'না না—পিছু ডাকিনি, পিছু ডাকিনি আমি ডাকব পিছু!' মমতাকেই সাক্ষী মেনে বলল—'তুমি, ঝড় ঝাপটাকে ভয় করতেই হয়।'

মমতা স্নিগ্ধ একটু হাসল—'হয় বৈকি সনাতন।' মনিবের একমাত্র বংশধরের প্রতি বৃদ্ধের সতর্কতার অন্ত ছিল না। ... গেল।

'তা বলে চললে?' সনাতন না ডেকে বলল—'একটু ... গেলে হোত না! ডাকিনি বটে কিন্তু সাবধান তো করেছিলাম।'

'জ্বালাতন!' ভাস্কর স্নেহ-কষ্টের কণ্ঠে সনাতনকে ডেকে উঠল।

কিন্তু মমতা হেসে বলল—'চিন্তা কি সনাতন, আমি তো রইলাম সঙ্গে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' বলে সনাতন আবার কনিক নিয়ে কাজে লেগে গেল।

চলতে চলতে মমতা বলল—'যতো আগের কথাই মনে পড়ুক—এই পুরীতে ওকে অমনটি ছাড়া কখনো দেখিনি। বয়স কত হবে?'

ভাস্কর বলল—'ঠিকুজি কুষ্ঠি নেই। চেপে ধরলে ভেবে চিন্তে বলে—চার-পাঁচ কুড়ি হবে।'

মমতা হাসতে লাগল, কিন্তু ভাস্কর কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মমতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কি হোল আবার?'

'ভাবছি এখন গেলে ফিরতে কিন্তু দেরিই হয়ে যাবে।'

'যায় যাবে! কিন্তু [illegible] অজুহাত খুঁজে অস্থির হবেন না।'

'না, তাই [illegible]ছি—রাত হতেও পারে। মাসিমা, তোমার মামা ইরা হয়তো ভাবছেন [illegible]—ভাবনায় পড়বেন।'

মমতারও মুখের উপর লজ্জার আরক্ত আভা পড়ল। কিন্তু জোর করে সেটা কাটিয়ে বলল—'হয়তো কেন নিশ্চয় ভাবতেন। কিন্তু মা জানেন যে আপনি [illegible] আছেন।'

আর কথা হোল না। দু'জনে পথ ধরে চলতে লাগল।

২

মমতা যে বলেছিল, দোকান-পসার কত মানুষের মেলা—ভিড়ে পৌঁছে ভাস্কর দেখল তার একটা বর্ণও মিথ্যা নয়। এমন কি তার 'নরমুণ্ডের সমুদ্র' পর্যন্ত সত্য। উৎসবই বটে! সংসারে হেন জিনিস নেই যার যত ক্ষুদ্রই হোক একটা নমুনা অন্ততো সেই হোগলা-ঘেরা ময়দানটাতে এসে পৌঁছায়নি—খেলনার দোকান খাবারের দোকান বাসনের দোকান পোষাকের দোকান ম্যাজিক সার্কাস।

উভয়ে নানা দৃশ্য দেখার পরে একস্থানে তন্ময় হয়ে সার্কাস দেখছিল—একটা ফিরিঙ্গী সার্কাস-পার্টি। মস্ত নামের মস্ত উঁচু তাঁবু ফেলেছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সমাগত দর্শকদের উল্লাসধ্বনি আর হাত-তালির মধ্যে তারা একটার পর একটা বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ খেলার মধ্যেই উল্লাসধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল, দর্শকরা রুষ্ট হয়ে উঠল, একটা হাত-তালিও আর শোনা গেল না। সেই অটুট নিঃশব্দতার মধ্যে একটা ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়ের ভাঙা হিন্দি যেন মেচে [illegible] গরল ছিটোতে লাগল—'কই আসুক দেখি! দেশী

আদমিদের মধ্যে এমন একটাও বুকের পাটা কি এই শিকল ভাঙবে ?'

কারও মুখে আর কথা নেই।

খেলোয়াড়-প্রবর বুকে শিকল-ভাঙার একটা কসরৎ সবেমাত্র শেষ করেছিল। দর্শকদের মধ্যে কেউ যে ইচ্ছুক ছিল না এমন নয়, কিন্তু সহস্র উৎসুক দৃষ্টির সামনে যদি না পেরে ওঠে তবে যে-মাথাকাটা ব্যাপার হবে তা ভেবেই আর অগ্রসর হোল না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। অটুট স্তব্ধতা ক্রমে অস্ফুট গুঞ্জনে রূপান্তরিত হোল। দর্শকদের মধ্য থেকে মন্তব্যও শোনা গেল—'বাবু-ভায়াদের কেউ কি এগোবে ভেবেছ ?'

'রেখে দাও। আস্তিন গোটাতে গেলে খোলার হাওয়ায় উড়ে পড়বে না !'

ভাস্কর কেমন এক রকম বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, এসব কাণ্ডের সঙ্গে পরিচয়ও তার কম। সজাগ হতে নিঃশ্বাস ফেলে সরে আসছিল—যতো সব ছেলেমানুষী কাণ্ড আর যত সস্তা কথা, এর মধ্যে মিশে গিয়ে ভাল করেনি। কিন্তু মমতার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় চমক খেয়ে গেল—সে মুখ অপমানের ব্যথায় একেবারে কালো হয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধও হোল। ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেল ফিরিঙ্গী-তনয় অট্টহাসি হাসছে—'কোই আয়া নহি ! অচ্ছী বাত—তো দেখো দুসরা খেল্।'

কিন্তু তার 'দুসরা খেল্' দেখাতে কিছু বিলম্ব ঘটে গেল যখন দেখল সেই দেশী লোকদের একজন উঠে দর্শকদের মধ্য দিয়ে সোজা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। দর্শকরা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি কিন্তু পরক্ষণে হাত-তালি আর উল্লাসধ্বনির অন্ত রাখল না।

হাত-তালির ঝড় থেমে গেলে উৎসুক প্রশ্নের বান বয়ে গেল—'কে ও ? কি উনি ? কোথায় বাড়ি ?'

অগত্যা ফটক খুলে দু'জনে গৃহের দিকে অগ্রসর হোল। দেখা গেল মামার ঘরে আলো জলছে। আঁধারে জানলা-দু'টোর উজ্জল শার্সি দুটো অপেক্ষমান সজাগ চোখের মতো। এত বিলম্বে একলা ফিরতে মমতার যে কুণ্ঠা জাগছিল সে পথের আঁধারের জন্যে নয়—পথের শেষের ওই চোখ-জোড়ার জন্যে। ভাস্করকে তাই ছেড়ে দিল না।

৩

সচরাচর ভুবনবাবু এতক্ষণে আলো কমিয়ে শয্যা আশ্রয় করেন। লম্বা কাঠির মতো চেহারা, গলায় অষ্টপ্রহর গলাবন্ধ জড়ানো, বারোমাস ভুগে ভুগে যথাসময়ের আগে তিনি পেন্সন নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এখনও ঘরে আলো জলছিল এবং এই নিঃসন্তান বিপত্নীক ইজি-চেয়ারে পড়ে কিছু একটা স্থির করেই অস্থির হয়েছিলেন।

অদূরে আলোর পাশে বসে বসুমতী ধোবার খাতা দেখছিলেন।

ভাই আর বোন দুই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। বসুমতীর শান্ত স্বভাব, সহ্যশক্তি সর্বসহা মাটির মতো। নচেৎ বাসায় বাসায় চির-ভ্রাম্যমান স্বামীকে হারিয়ে যেদিন দু'বছরের মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের কাছে এসে উঠেছিলেন, তার পর থেকে এ পর্যন্ত যে-স্রোত ঠেলতে হয়েছে তাতে ডুবে ভেসে যেতেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি সংকল্প ভোলেননি। মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কিছুদিন আগে আশ্রমে দিয়েছিলেন—যাতে সংসারেরও সাশ্রয় হয়েছিল, ভুবনবাবুও নরম হয়েছিলেন।

কিন্তু ইদানীং ভুবনবাবু আশ্রমের নামেও যেন ক্ষেপে উঠছিলেন। জানলার বাইরের আঁধার থেকে উৎসুক দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে চেয়ারের

মধ্যে নড়েচড়ে বসে বললেন—'আর একবার মেয়েটার খোঁজ নিলিনে? কিসে ভাল কিসে মন্দ এ-বোধটাও কি বিসর্জন দিয়েছিস?'

বসুমতী ধোবার খাতা রেখে দিনের খরচ লিখছিলেন, কথা বললেন না।

'শুনছিস?' ভুবনবাবু খিটমিট করতে থাকেন।

'বলো।'

'বলব! আর কি আমাকে তোর জমাদার হিসেবে রেখেছিস? মেয়েটার খোঁজ নিবিনে?'

'ভাস্করের সঙ্গে গেছে, আসবেই যখন হোক।'

'যখন হোক!' ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—'দেখ, তোকে একটা কথা বলি—যখন ছোট ছিল, ছিল। এখন বয়স হয়েছে, বড় হয়েছে—এটা তো মানবি?'

'ভুল করবার সম্ভাবনা সেই জন্যেই তো কম।' বসুমতী হিসাব লেখায় মন দিলেন।

ভুবনবাবু অন্তরে অন্তরে গরম হলেও সে-ভাব দমন রেখে বললেন—'কিন্তু মানুষে তো ভুল বুঝতে পারে, পাঁচটা বানিয়ে বলতে পারে। আর পারবে কি—বলে না ভেবেছিস? এই-যে তিরিশ দিনই যায়, শুনি তার হিসেব-পত্র এমন কি হেঁসেল পর্যন্ত দেখা-শোনা করে—আমি বটে চুপ করে থাকি, কিন্তু মানুষ বলে না? মানুষ ছেড়ে দেয়?'

বসুমতী বললেন—'তোমার মালিশটা কি গরম করে দেব, দাদা? সময় হয়ে গেছে।'

ভুবনবাবু এক-মুহূর্ত নির্বাক হয়ে গেলেন, শেষে ক্ষুণ্ণ মুখে ঘাড় নেড়ে বললেন—'দাও।' একটু অপেক্ষা করে আবার যখন কথা বললেন গলাটা শোনাল আশ্চর্যরকম শান্ত, বললেন—'মানলাম যে কথা এখনো ওঠেনি।

কিন্তু উঠতে কতক্ষণ!' মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে? তাছাড়া, ওই যে উদয় ছেলেটি আসা-যাওয়া করে, কত ভাল পাত্র বল দেখি। ওর মনে যাতে না কোন ধাঁধা লাগে—বুঝলিনে?'

বসুমতী মাথা নাড়ালেন।

ভুবনবাবু রেগে উঠলেন—'বুঝিছিস! কিচ্ছু বুঝিস-নি! তুই সেই ছোটকালের বোনটি তালই আছিস। বেশ, বুঝলে তো বুঝে চলবি?'

'তাই নিষেধ পারিনে।' বসুমতী কলম রেখে আবার বললেন—'যখন ছোট ছিল, ছিল। আর তো ও ছোট মেয়ে নয়। তা'ছাড়া ওর মত ও খুলে বলেছে।'

সে সংবাদ দাদাও জানতেন, কিন্তু কথায় তার ঘুণাক্ষরেও আভাস দিলেন না। বললেন—'সেই কথাই তো বলছি। সেই মতটা যাতে না বিপথে চলে যায়, যাতে ওর ভালর জন্যে ও হীরেই আঁচলে বাঁধে সে তো দেখতে হবে। উদয় খাঁটি হীরে। সেদিনকার ছেলে—কিন্তু ঠিকেদারি শেয়ারের বাজার থেকে সরকারী মহল পর্যন্ত হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে ও বেনামে কি স্বনামে না আসন জুড়েছে।'

'বিষয়বুদ্ধিতে ওর দোসর তো নেই-ই।'

'বিষয়বুদ্ধি!' ভুবনবাবু গলাবন্ধ ঢিল করে বসে বললেন—'শোভা-যাত্রায় সবার আগে ঝাণ্ডা নিয়ে ওকে তা'হলে চলতে দেখিসনি! সভাসমিতিতে ও খদ্দর ছাড়া কখনো পরে না, মাথায় গান্ধী-টুপি থাকে। নিজে তো একজন কতো বড় মালিক, কিন্তু ধর্মঘটে হরতালে মজুরি-আদায়ে ওই সবার আগে—না হলে কি নির্বাচনে জেতে ভেবেছিস? দেশের যারা নবীন যারা কাঁচা তাদের পর ওর কতো প্রভাব!'

'কিন্তু ওরা যে কাঁচা-ই, দাদা।' বলে বসুমতী খাতা নিয়ে উঠে পড়বার উদ্যোগ করলেন।

ভুবনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—'মেয়েকে তুই শাসন করবি কি-না ?'

বসুমতীও বসে পড়লেন—'শাসন !'—ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখ থেকে আর দ্বিতীয় কথা বের হোল না।

এমন সময় সিঁড়িতে ভাস্কর ও মমতার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আঁধার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মমতা ভাস্করকে সাবধান করছে—'দেখবেন কিন্তু সামনে-টা বড় গোলমেলে।'

ভাস্করও উত্তর দিল—'একেবারে অচেনাও তো নয়।'

দু'জনের হাসির শব্দ শোনা গেল।

ভুবনবাবু চেয়ারের মধ্যে শিথিল হয়ে বসে বললেন—'এক কাজ কর, এখনই যেন ওদের কিছু বলে বসিস নে!' তাঁর গলার স্বরে তাপ ছিল না।

বসুমতী বললেন—'কিন্তু তুমি তো মনে করো, বলা দরকার।'

ভুবনবাবু তীব্র চোখে ভগ্নীর দিকে তাকালেন কিন্তু দরজার দিকে নজর পড়ায় স্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'এই যে ভাস্কর, এস এস। অনেক দিন আসোনি—তোমার কথাই বলছিলাম।'

সে নমস্কার করে এগিয়ে এলে, ভুবনবাবু সমাদরে সামনের মোড়াটা দেখিয়ে বললেন—'বোস। তারপর—সংবাদ কি ?'

ওরা প্রবেশ করলেই বসুমতী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ডাকলেন—'মমতা !'

ভুবনবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চিঁচিঁ করে বলতে লাগলেন—'না মা, খুঁজে পেয়েছি—পেয়েছি, এই দেখ।' চশমার খাপটা দেখিয়ে বললেন—'সন্ধ্যা থেকেই খুঁজছিলাম, পাচ্ছিলাম না। সব জিনিসই আঙুলের ডগায় রেখে রেখে মামার অবস্থা এমন করে তুলেছিস যে, এক'

মুহূর্ত পাশে না থাকলে আঁধার দেখি। এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে?' কণ্ঠে তাঁর প্রবল স্নেহ প্রকাশ পেল।

ভুবনবাবুর মুস্কিল যে, দীর্ঘকাল রোগে পড়ে থেকে মন হয়ে উঠেছে, পুরোপুরি পর-মুখাপেক্ষী। কাউকেই সামনা-সামনি অসন্তুষ্ট করবার সাহস নেই। নির্ধন বলে ভাস্করের পর চিত্ত অনুকূল নয়, কিন্তু এমন একটা দিন—যখন সে আর আসে না, তাকে ডাকলেও তিনি পান না—সে ভুবনবাবু ভাবতেও পারেন না।

মামার প্রশ্ন শুনে মমতা ভাস্করের দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল—'সেই কথা বলব বলেই তো ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম। সে এক—'

কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ভুবনবাবু চকিত হলেন—'ধরে নিয়ে এলি! কেন? কি করেছে ও—দু'জনে কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ভাস্কর আরক্ত হয়ে উঠল।

মামার সন্দেহের চেহারা বুঝে মমতার মুখের উপর লজ্জা ও রোষের আভা পড়ল। সে সহজভাবে শুধু বলল—'মেলায়।' তারপর চুপ করে থাকল।

বসুমতী খাতা ও কলম তুলে রেখে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাচ্ছিলেন, বললেন ভাস্করকে—'আজ আবার না খেয়ে কিন্তু পালিয়ে যেয়ো না।'

'কিন্তু—', ভাস্কর আরও কিছু বলতে গেল।

বসুমতী হেসে বললেন—'বলবে কি কি অসুবিধে—এই তো? গলার বোতাম খুলে দিয়ে এই জানলার ধারটায় বস, আমার দেরি হবে না।'

তিনি চলে গেলেও ভাস্কর বারংবার বলতে লাগল—'মুস্কিল, মুস্কিল যে ওরা আবার বসে থাকবে।'

ভুবনবাবু চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। ভাস্কর অল্প অল্প ঘামছিল—সেটাও দেখতে পেলেন। একটু পূর্বেও তিনি উদয় ... অনেক

কথা বলেছিলেন, কিন্তু ভাস্করই যে বসুমতীর স্নেহের পাত্র—আজও সে আসলেই আহারের নিমন্ত্রণ হোল তাই নয়, তার কপালের ঘর্মবিন্দুও বসুমতীর দৃষ্টি এড়াল না—জানলার হাওয়ায় বসতে বলে গেল, এ সমস্তই ভুবনবাবুর চোখে পড়ল। মুখে জোর করে হাসি এনে বলতে লাগলেন—'ওরা' মানে তো ঠাকুর-চাকর, ঝিমোতে দাও তাদের—ঝিমোতে দাও! সংসারে তুমিই সুখী ভাস্কর, ভাগ্যবান তুমি।'

সহসা ভাগ্যবান হবার হেতু না বুঝে ভাস্কর উল্লসিত হতে পারল না, মুখ তুলে তাকাল।

ভুবনবাবু বললেন—'ভূতের বেগার ঠেলতে হোল না। একেবারে একা। আমি হলে কম্বল সম্বল করে ভেসে পড়তাম।' একটু থেমে বললেন—'শুনলাম নাকি পুরস্কারও পেয়েছ কোন মহাসভা থেকে?'

ভাস্কর কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নাড়ল।

মমতা বলল—'শুধু পুরস্কারই নয়, মামা! মূর্তিটার যা দাম উঠেছে সত্যি ভাল।'

মামা ভাগ্নীর দিকে একঝলক তাকালেন, শেষে ভাস্করকেই বললেন—'আনন্দের কথা। আমাদের কালে স্কুল-কলেজে প্রথম হলে বই-পত্র, খাতা-পেন্সিল পুরস্কার দিত—এখন শুনি যে, সব তাতেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ফ্যাশান। টাকাই দেয় তো—পেলে কি রকম?'

ভাস্কর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, মৃদুকণ্ঠে বলল—'শুনেছি হাজার পাঁচেক দেবে।'

'পাঁ-চ হাজার!' ভুবনবাবু মমতার দিকে চেয়ে বললেন—'মূর্তির দাম আলাদা বললি নে? টাকাটা কি হাতে পেয়েছ ভাস্কর?'

'না, কাগজে ঘোষণা দেখেছি। ওদের নিয়ম, দাম-পুরস্কার নম্বরের

পথে দেওয়া। হয়তো আশ্রমের আগামী উৎসবে দেবে, আশ্রমের হাত দিয়েই পাঠিয়েছিলাম।'

ভুবনবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'তাই বলো। আমি ভাবলাম ত্যি দিয়ে দিল। হিসেব এখনো কাগজে-কালি—'

মমতা ব্যস্ত হয়ে বলল—'মামা, তোমাকে যে এক কাণ্ড শুনাব বলেছিলাম। ভুলে গেছে বুঝি?'

ভুবনবাবু চেয়ারের মধ্যে হেলে বসলেন। বললেন—'এ-রকম গল্পই তো শোনাবি। বল। পোড়া বাত নিয়ে নিজে তো কোথাও গিয়ে দেখতে পারব না।'

কিছুক্ষণ পরে ভাস্করকে সমুখে বসে খাওয়াতে খাওয়াতে বসুমতী বললেন—'কেবল মূর্তি আর আশ্রম নিয়ে থাকলে তো ঘর চলবে না, ঘরও যে দেশ—সংসারে লক্ষ্মী আনো।'

ভাস্কর বলল—'আগে তাঁর আসনটিকে মুক্ত করে আনি। বাড়িই যে মর্টগেজে বাঁধা—তাও ডিক্রী হয়ে আছে।'

বসুমতী বললেন—'মমতা বলে, সে-টাকাও তো কিস্তি করে শোধ দিচ্ছ। এ-পর্যন্ত কত দেওয়া হোল?'

ভাস্কর একটু চিন্তা করে হেসে বলল—'দেখছি জানিনে। কিন্তু 'দিচ্ছি' বললেও ঠিক হয় না—টাকা আমি আনি বটে কিন্তু—ব্যবস্থা আমি করিনে।' বলে তাকিয়ে দেখল, মমতা নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে। ভাস্কর বলল—'না হলে সনাতন আর মন্ত্রী লোচন দু'জনে মিলে ব্যবস্থা যা উত্তম করেছিল তাতেও বাড়ির মুক্তি হোত বটে, কিন্তু একেবারে যমুনাপ্রসাদের জঠরে গিয়ে।' হাসতে লাগল।

বসুমতী একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—'যমুনাপ্রসাদ কে?'

শ্যামলা শীতলা পুণ্যবতী কন্যা,—সমুদ্র স্নান থেকে সবেমাত্র উঠে আসছেন, তনুতে চওড়া পেড়ে পট্টবাস, মুখ-শ্রী শান্ত, দুটি চোখ আয়ত,—ভেজা চুলগুলি ঝুলে পড়েছে পিঠ ছাড়িয়ে।—ফুল-ফলের ডালি সাজিয়ে মৃদু পায়ে যেন এক দেবমন্দিরের সোপান বেয়ে উঠে চলেছেন—কোন কল্যাণের জন্য তাঁর এই পূজো দেওয়া কে বলবে! কিন্তু স্নেহে-ক্ষমায় মমতার এমন মূর্তি বুঝি আর কোন দেশেরই নয়।'

ভাস্কর যে কি-কথা বলবে এবার বুঝতে পেরে মমতা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—এ তার নতুন অনুরোধ নয়। তাড়াতাড়ি হাসি-মুখে বলল—'তা বলে এই হানাহানির, শক্তি-দখলের দিনে শান্তির সেই নম্র-মূর্তি গড়তে চাওয়া! লোকে যে বলবে রোমের আগুনে নিরোর বাজনার মতো!'

গামলার মাটিতে হাত ডোবানই রইল, ভাস্কর ফিরে তাকাল।

মমতা কুন্ঠিত হেসে বলল—'এখন তো দেশের তাতে দরকার নেই। সে-মূর্তি অপেক্ষা করতে পারবেন যিনি চিরকালের। ভাবুক, শিল্পী এঁদের কাছ থেকে আজ তাকে পেয়ে আমাদের মন ওঠে না—ওঠবার কথাও নয়।'

ভাস্কর অদম্য ইচ্ছাকে যেন সংযত করে আনল, বলল—'তা হয়তো নয়। কারও কোন উপকার হোত কিনা—তাও জানিনে, কিন্তু এই শিল্পীর অন্তরে স্বর্গবাস হোত। এ-যুগে শিল্পীর মতো উপবাসী তো কেউ নয়।'

মমতা তথাপি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সলজ্জ হেসে বলল—'কিন্তু মানুষের ছায়া নিয়ে দেবতা গড়লে কি হয় জানেন?'

'কিছুই হয় না!' ভাস্কর বলল—'প্রতিমারও শক্ত কাঠামোর জন্যে খড়-কাঠ লাগে—পটুয়া মানুষ যে! আর এ তো শুধু মূর্তি। সুমুখে 'আদর্শ' কাউকে স্থির না রাখলে আমরা রচনা পারিনে—কোন শিল্পীই পারে না।'

মমতা গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগল।

ভাস্কর বলল এবং তার কণ্ঠস্বরে আগ্রহও গোপন থাকল না—'তা ছাড়া, যদি সত্যি হয় যে দেবতা নিজের ছায়ায় মানুষ গড়েছিলেন তবে সেই মানুষের ছায়াতে তাঁকে গড়লে অমিল হবার নয়—এতে অপরাধ হবে কেন? কেন দোষ থাকবে বলো!'

'কিসে?' মমতা চকিত হয়ে হেসে উঠল—'সুমুখের ওই চেয়ারটাতে চুপচাপ শুধু মুখ বুজে বসে থাকায়?' বলে লজ্জাভরা মুখখানাকে বাঁকা করে লুকোতে চাইল। বস্তুতঃ ভাস্করের অনেকদিনের ইচ্ছা যে মমতাকে 'আদর্শ' করে একখানা মূর্তি রচনা করে, কিন্তু সেও কিছুতেই 'বিশেষ' হয়ে বসে থাকবার অপরিসীম শরমকে কাটাতে পারে না।

'সত্যি পারবে না?'

মমতা চুপ করে থাকে।

'বলো—কি, কি হয়েছে রে?' ভাস্কর সহসা দরজার দিকে ফিরে তাকাল।

লোচন এক পাঁজা জ্বালানি-কাঠ বগলে নিয়েই দ্রুতপদে ভিতরে এসে পড়েছিল। তার চোখ-মুখ শুকিয়ে উঠেছে, উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বলে উঠল—'সেপাই—সেপাই এসেছে।'

মমতা বিস্মিত হয়ে বলল—'সেপাই?'

'আলবৎ সেপাই। পুলিশ।' ভাবে মনে হোল লোচনচন্দ্র শপথ করতেও রাজী।

'কি চায় সে?'

'সোজা চলে আসছে—কি চায় জানিনে!'

উভয়ে উৎসুক হয়ে অগ্রসর হোল, লোচনও তাদের পিছন পিছন একপ্রকার রুদ্ধনিঃশ্বাসেই এগিয়ে চলল।

দরজা পার হলেই লোচনচন্দ্রের ভীতি-উৎপাদনকারী সেপাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ—সে তার তালপাতার মতো নিরীহ শরীর আরও বাঁকিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে সেলাম করল। আগন্তুক কোন সাহেব-সুবার পিয়ন-চাপরাসী হবে। দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে এসেও জনপ্রাণী না দেখতে পেয়ে বোধ হয় ভাবছিল, সে নিজেই ভয় পাবে কিনা।

সেপাইয়ের চেহারা দেখে মমতা মুখ টিপে লোচনের দিকে তাকাল। লোকটার সবিনয় অভিবাদনও লোচনচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে পর্বত-প্রমাণ ভুল করেছে বুঝতে পেরে নিমেষে পিছন থেকে একেবারে সামনে এসে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'কি চাই?'

তার কণ্ঠের প্রচণ্ডতায় চমকে উঠে আগন্তুক তার দিকে একবার তাকাল কিন্তু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ভাস্করকেই, বলল—'আমি পাঁচু। সরকারী কুঠি থেকে আসছি, বাবু।' সে মাজার চাপরাস সরিয়ে উর্দির ভিতর খুঁজে একখানা চিঠি বের করতে লাগল।

লোচনের মানহানি জাতীয় ব্যাপারটা মমতা প্রত্যক্ষ করেছিল। তাকে রান্নাঘরে পাঠাতে তাঁর নিজেরও গরজ স্মরণ করে বলল—'তুমি যাও লোচন।'

লোচনের কৌতূহল তখনও মেটেনি। কিন্তু আদিষ্ট হয়ে সে লোকটার দিকে এমন অর্থপূর্ণ ভাবে চেয়ে চলে গেল যেন বলে গেল—মনিবই যখন উপস্থিত তখন তার সঙ্গেই বাত-চিত করো, না'হলে মনে রেখো আমার প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হোত।

ভাস্কর বলল—'আমার হাতে কাদা, মমতা। পড়ো।'

মমতা চিঠি নিয়ে পড়ে শোনাল। সংক্ষিপ্ত চিঠি। এসেছে 'লালকুঠি' থেকেই বটে—সেখানে সন্ধ্যায় ভাস্করকে চায়ের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। মেয়েলী কিন্তু পাকা হস্তাক্ষরে অনন্যোপায় জানিয়ে উপস্থিতি পত্রযোগেই

চাওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি যে অপেক্ষা করে থাকবেন পরিশেষে সে-কথাও বিশেষ করে জানানো হয়েছে। স্বাক্ষর করেছেন, মমতা পড়ল—কৃষ্ণা গুপ্তা।

চিঠি পড়তে পড়তে তার কণ্ঠস্বর চিন্তিত হয়ে আসছিল, শেষ করে প্রেরিকার নামের প্রত্যেকটা বর্ণ মমতা এক এক করে উচ্চারণ করল—'কৃ-ষ্ণা গু-প্তা! কে ইনি?'

'জানিনে।'

ভাস্কর আর কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

'জানিনে!' মমতার কণ্ঠে চাঞ্চল্য ফুটে বেরোল। কারণ একে তো কাল সন্ধ্যা থেকে কেবলে 'জানিনে'র অনুবৃত্তি চলছিল, তার উপর আজ সন্ধ্যার জন্যে সে নিজেও কিছু উদ্যোগ-আয়োজন করেছে—বুড়ো-মানুষ, এতক্ষণ বোধহয় বাজারে পৌঁছে গেল, এখন এ-সব স্থগিত রাখাও অসম্ভব।

ভাস্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—অপরিচিতার নিমন্ত্রণ তাকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু মমতার চাঞ্চল্য তার কম করল না।

পাঁচু বলল—'দিদিসাহেব জবাব চেয়েছেন।'

মমতা নিঃশ্বাস ফেলল। ভাস্করের দিকে তাকিয়ে বলল—'জানিনে বললে তো জবাব হবে না, তিনিও বুঝবেন না। জানিনে!'

ভাস্কর চোখ নামিয়ে নিল। মমতার সুরে ক্ষোভ থাকলেও, তার কিছু পূর্বের সেই তন্ময়-ভাবটা তখনও কাটেনি। তাই অতি সহজেই উত্তর দিল—'আর জানলেই বা কি, আমার যাওয়া তো তা বলে সম্ভব নয়!'

'ঠিক! সত্যি বলছেন—যাবেন না আপনি?'

ভাস্কর তেমন ভাবেই মাথা নেড়ে বলল—'না। কিন্তু তুমিই বা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

মমতা সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল—'বেশ হোল, সত্যি এমন ভয় পেয়েছিলাম—যে এই গেলেন বুঝি।'

পাঁচু ডাকল—'বাবু!'

মমতাই ওকে উত্তর দিয়ে দিল—'বাবু তো আজ যেতে পারবেন না—তুমি মুখেই ব'লো, কেমন?'

পাঁচু ভাস্করের দিকে একবার চেয়ে দেখে মাথা নেড়ে সেলাম করে চলে গেল। সে যেতেই কিন্তু ভাস্করের মুখ গম্ভীর হয়ে এল।

উভয়ে আবার ভিতরে রওনা হলে ভাস্করের আপাত-গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে মমতা বলল—'কিন্তু এদিকে টানলেন বলে ঠকে গেলেন, এমন ভাববেন না। বিশ্বাস হচ্ছে না? ফলের জন্য ধৈর্য ধরেই দেখুন।'

মমতা দেখতে পেল না, কিন্তু ভাস্করের মুখের উপর কুঞ্চনের কয়েকটা দাগ পড়ে আবার মিলিয়ে গেল।

পূর্ব-স্থানে পৌছলে ভাস্কর মণ্টি টেনে নিল। মমতা হাতের চিঠিখানা সিংহের গ্রাসে ঠেলে দিয়ে পরিহাসের ছলে বলল—'যেমন প্রস্তাব এনেছিলেন তেমন এখন থাকুন এর মাঝে কয়েদ।'

ভাস্কর তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কথা বলল না।

মমতা কণ্ঠের তারল্যটুকু মুছে এনে বলল—'যাক। মাস্টারমশায়ের মুক্তিতে তা'হলে হাত দিচ্ছেন। কবে দেবেন?'

'দেখি। দিতে হবে বৈকি।'

'মাস্টারমশায় যাবার আগে তো সংবাদ দিয়ে যাবেন?'

ভাস্কর নিস্পৃহের মতো মাথা দোলাল, জবাব দিল না।

তার গাম্ভীর্য মমতাকে এবার নাড়া দিল। কিন্তু গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়েই সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'ইস, অমন করে ও কেটে গেছে নাকি?' ভাস্কর কাদা তৈরির জন্য জামার হাতা অনেকখানি

গায়ে জুতা ছিল, বুকের বোতামও গোটাকতক খোলা। দুই মুক্ত বাহু এবং বুকে পেঁচিয়ে ফুলে ওঠা লাল মোটা দাগ—স্পষ্টতই শিকল ছেঁড়ার ফল।

মমতা বলল—'বিষিয়ে উঠেছে ?'

ভাস্কর বলল—'না। শুধু দাগ।'

মমতার শঙ্কা গেল না, বলল—'কি করে জানলেন! যদি বেশী হয় ?'

'না।'

'না আবার কি। হয়তো পরামর্শ নিতে এখনি কাউকে দেখান দরকার।'

ভাস্কর এর আর কোন উত্তর দিল না।

মমতা ব্যথিত হলেও মনে মনে ম্লান হাসল। বুঝল তার স্বভাব-বিপরীত আচরণ ভাস্করকে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ করেছে, কিন্তু তা'বলে এখনই কিছু প্রকাশ না ক'রে সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত আনন্দ দেবার লোভও সে আর ছাড়তে পারল না। নীরব হয়ে গেল।

ভাস্কর আরও আশ্চর্য হোল। তার গুরুতর কিছু হতেও পারে একবার এ-সম্ভাবনা মনে ওঠার পর মমতার যা চিরকালের স্বভাব অর্থাৎ প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করা, তা না করে সে যে এত সহজেই রেহাই দিল তাকে—এ উপশমে ভাস্করের আজ হাল্কা লাগল না, বরঞ্চ নিজেকে যেন ভারাক্রান্তই অনুভব করল।

৫

আশ্রমে গেলে মমতা নিমন্ত্রণের অধ্যায়ও নিঃশব্দে সেরে আনতে তৎপর হোল। বয়ন-বিভাগের উর্মিলাকে নিমন্ত্রণ করলে সে মাথা

নেড়ে গ্রহণ করল কিন্তু হেসে বলল—'তা তুই যে ? ব্যবস্থা হোল ওঁর বাড়ি, নেমন্তন্ন করছিস তুই !' সে তাঁতে বসে মাকুতে সুতো পরাচ্ছিল।

মমতা বলল—'কল্পনায় অমনি তোর তাঁত-বোনা সুরু করলি তো ?'

'টানা-পড়েন তুমি যোগালে কি করব ভাই।'

'কি বলতে চাস ?'

'টানা-হেঁচড়ার কথাই বলছি—একটা নেমন্তন্ন তো অনেকদিন থেকেই আশা করে আছি, ওই বাড়িতে এ পর্যন্ত মিলেও যাচ্ছে বটে—কিন্তু সানাইটার যে ঠিকানা পাচ্ছিনে !'

'উর্মি !'

'আচ্ছা, আচ্ছা—না হয় তুই-ই করলি। আপত্তি করছি নে।'

মমতা বুঝিয়ে বলল—'ভেবে দেখ ভদ্রলোকের অবস্থাটা। একে তো কাজ নিয়ে নিরবসর, তার ওপর নেমন্তন্নের উপলক্ষে শিকল-ভাঙার গন্ধ থাকায় লাজুক হয়ে আছেন। দেখতে বেচে নেওয়া অভিনন্দন ঠেকবে বলে রাজীই ছিলেন না—'

'অগত্যা তুমিই সব গছে নিয়ে করে দিচ্ছ। বন্ধু বটে !' বলে উর্মিলা হাসল কিন্তু তার পরের কথায় চিন্তার ভাবও গোপন রইল না—'কিন্তু তুই যেন ভুলে গেছিস ভাই—আশ্রমে যতীবন্ধুর মতো সুহৃদও আছেন, আর তাঁদের স্নেহদৃষ্টি কোন সময় চোখ বুজেও বসে থাকে না।'

মমতা জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল। পাশের ঘর থেকে তাঁত চলার খটাখট্ শব্দ আসতে থাকে।

উর্মিলা বলল—'কালই কিনা বলছিলেন—মমতার মতো শান্ত বালিকা ছিল না, মমতার মতো অশান্ত বালিকাও নেই—মমতা সবার আদর্শ ছিল' মমতা কারও আদর্শ নয়। উঁহু—হাসিস নে। কথা তাঁর সাধু-ভাষাতেই

বটে—যেমন বলে থাকেন, কিন্তু যা বোঝাতে চাইলেন তা মোটেই সাধু নয়।'

উর্মিলার বক্তব্য অস্পষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে 'আশ্রম' যুক্ত। তা'ছাড়া, ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সাথে বয়স্কদের কুটির-শিল্পের কারখানা ও বৃত্তি-শিক্ষার নানা ব্যবস্থাও ছিল—যতীবন্ধু এ-সবের চাঁদা-আদায়, দান-সংগ্রহকারী থেকে অন্যতম তত্ত্বাবধায়কও বটে। ভাষা তিনি যেমন ব্যাকরণ মিলিয়ে বলেন, সকলের চাল-চলনের উপর তাঁর নীতি-বোধের ব্যাকরণও তেমনই উদ্যত। এ-কাজে কোথাও তাঁর কোমলতা ছিল না। ভাস্করের নামের সাথে মমতার নাম জড়িত হয়ে তাঁর মনে উঠেছে—এ কথা মমতাকে সমঝে দেওয়াই উর্মিলার অভিপ্রায় ছিল।

মমতা বলল—'আমি ভাবছি আচার্যদেবকে বললে কেমন হয়!'

'কি? নালিশ?' উর্মিলা চকিত হোল।

'সন্ধ্যায় যদি উনিও ওখানে আসেন।'

'ও।' বলে উর্মিলা আবার মাকুর দিকে মুখ নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—'উনি কি যাবেন! তা'ছাড়া আমাদের ওই সব গণ্ডীর মধ্যে ওঁকে যেন ধরে না—মানায় না। প্রতি পদেই মনে হতে থাকে, চলতে গেলে আমাদের ছোট চৌকাঠে ওঁর যেন মাথা ঠেকে যাবে। তুমি বাদ দাও।'

'তাই দিয়েছি। তুই কিন্তু একটু আগে যাস।' মমতা উঠল।

'একটু কেন, একদিন তো অনেক আগেই যেতে হবে। সাজানো গোছানো--কিন্তু আজ তা বলে—'

মমতা যেতে যেতে হেসে বলল—'বলবার সুযোগ পেয়েছিস, আর কি তুই ছাড়তে পারিস। সেই মেয়েই কিনা!'

মমতা শিক্ষয়িত্রী। বাঁধা কাজের অবসরে এমন করে নিকট ক'জনকেই নিমন্ত্রণ প্রায় সেরে এনেছিল, কিন্তু যখন ছুটির সময় হয়ে এলেও গঙ্গাদাসের দেখা পেল না—নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। গোপনে প্রায় সব ব্যবস্থা করে আনলেও শেষ পর্যন্ত কি ভাস্করকে জানাতে হবে—নতুবা ছুটির পরে গঙ্গাদাসকে সংবাদ দেবার অন্য উপায় কি।

শুনেছিল গঙ্গাদাস বাইরে কোথায় গেছে—শেষের দিকে ফিরে আসবার কথা।

বয়স্কদের ছুটির আগে ছেলেমেয়েদের ছুটি হয়ে গেলে মমতা তাই আর একবার গঙ্গাদাসের খোঁজ নিতে দপ্তরীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এমন সময় জানলা দিয়ে আশ্রমের অঙ্গনের পর নজর পড়লে হৃষ্ট হবে কি বিষণ্ণ হবে বুঝতে পারল না—গঙ্গাদাসই বটে। অজস্র কথা বলে হেঁটে যাচ্ছে। কি সুবিধাই হোত—কিন্তু একলা সে তো নয়ই, পরন্তু ভাস্করই তার সঙ্গে চলেছিল। মমতা বিস্মিতও হোল—ভাস্কর চান ক্ষণি, রুক্ষ-সূক্ষ্ম চুল, মন্থর ভাবে যেতে যেতে দু'একটা হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা বলছে না। দু'জনে ছুটির পরে খাতা নিয়ে অফিসে যাচ্ছিল।

দপ্তরী এসে দাঁড়িয়েছিল, বলল—'দিদিমণি, ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আর দরকার নেই সতীশ। তুমি যাও।' বলে মমতা দ্রুতপদে প্রাঙ্গণে এসে নামল।

দু'বন্ধুতে এগিয়ে যাচ্ছিল, মমতা তাদের দিকে আসছে দেখে গঙ্গাদাস কথা থামিয়ে দাঁড়াল। তরুণ দার্শনিক, সুদর্শন চেহারায় সাদা-সিধা বেশভূষা, তুষ্টির একটা হাসি-ময় ভাব সর্বদা মুখে লেগে থাকে। ভাস্করও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু 'আমি যাই, তোমরা বরং আসি' বলে সে এগিয়ে চলে গেল। সে অনুভব না করে পারল না—সকালের পর এই তার মমতার সঙ্গে প্রথম দেখা।

গঙ্গাদাস অবস্থাটা মনে মনে উপভোগ করল। এ দু'জনের ভিতরের কথা সবাই জেনেছিল, সেও জানত। তবু ভাল যে, এতদিনে সেটা ওদের নিজেদেরও চোখে পড়তে লেগেছে।

মমতা নিকটে এলে গঙ্গাদাস ভাস্করকে ডাকতে গেল, ভাস্কর তখন অনেকখানি দূরে চলে গেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে আপসোস করল—'এই যাঃ? ধন্যবাদ দিতেই যে ভুলে গেলাম।'

মমতা বলল—'কিসের?'

গঙ্গাদাস হাসি চেপে বলল—'যে জন্যে এত জোরে হেঁটে আসছিলেন!'

মমতা নিশ্চল হয়ে চেয়ে রইল।

গঙ্গাদাস হাসতে লাগল—'একটু আগে আশ্রমে এসেই শুনে ফেলেছি। নেমন্তন্ন তো? সহকারীটি সত্যি উপকারী।'

কিন্তু পরিহাসেও মমতাকে উজ্জ্বল দেখাল না, বলল—'তিনি সবাইকে বলছেন বুঝি?'

'সবাইকে! মোটেই নয়। কিন্তু ভাস্কর কি ওকেও নেমন্তন্ন করছে নাকি!' গঙ্গাদাস অফিসের বারান্দার দিকে তাকাল।

মমতা দেখল ভাস্করের পিছন পিছন যতীবন্ধুও অফিসে ঢুকছেন। কিন্তু একে যতীবন্ধুকে কেউ কখনও ভালবেসে নিমন্ত্রণ করে না, তারপর গঙ্গাদাসই বা সহকারীর কাছ থেকে কতটা শুনেছে—ভাস্কর সেখানে ছিল কিনা—এই সব জানবার জন্য সে এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল যে কোন উত্তর দিল না।

গঙ্গাদাস চলতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে বলল—'ওকে নেমন্তন্ন করাই কিন্তু উচিত। যে-মুখ কেবলই তিতো তাকে মিষ্টি দিয়ে বন্ধ করলে পরোপকার হয়। কি বলছিলেন, রবি সবাইকে বলেছে কিনা? মোটেই নয়—আমাদের রবি তেমন কাঁচা ছেলেই নয়।'

গঙ্গাদাস হেসে বলল—'জানে যে অংশীদার বেশী জুটলে নিজের অংশে টান পড়তে পারে। সবাই গেলে বুদ্ধিমান যখন দেখল ঘরে আমিই আছি তার শুধু তখনই কানে কানে নেমন্তন্নের সু-সংবাদটি দিল। ভাস্করের বাড়ি সুতরাং আমার ডাক বাঁধা—ও না জানলে আমাকেই। কি বলতে ভেবেছেন?' বলে গঙ্গাদাস প্রাণখোলা হাসতে লাগল।

মমতাও সুগোপনে নিঃশ্বাস ফেলল—যাক, তবে ভাস্কর ছিল না। বলল—'অবশ্য যাবেন কিন্তু।'

'হ্যা, হ্যা—যাব বৈকি। ওর সঙ্গে পরামর্শও আছে।'

মমতা চলতে চলতে দেখতে পেল, সেই হাস্যময় মুখখানাতে গাম্ভীর্যের কেমন একটা ছায়াপাত হোল। কয়েক পা নিঃশব্দে চলে বলল—'আপনাদের পরামর্শটা কিসের?'

গঙ্গাদাস চলতে লাগল।

মমতা বলল—'বোধ করি আশ্রমের কিছু নয়?'

গঙ্গাদাস আরও কিছুটা এগিয়ে বলল—'কি জানেন, আশ্রম সম্বন্ধেই। আয় কমে যাওয়ায় যতীবন্ধু সব ব্যাপারেই গলদ দেখছেন। দারুবিভাগ চর্মবিভাগ মৃৎবিভাগ কোনটাকে যে চেপে ধরলে মুঠোয় ঝুট পাবেন নিজেই বুঝছেন না।···বলতে বাধা নেই, আজ এই নিয়ে সারাদিন ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেছি। কিছু হোল না, অথচ বাড়িতে প্রয়োজনও ছিল।'

মমতা ভালো-মানুষির ভান করে বলল—'বুঝেছি। বন্ধুকে তাই ধর্মঘটে টেনে নিয়ে দল বাড়াতে চান।'

আলোচনার অস্পষ্ট একটা ইচ্ছামাত্র গঙ্গাদাসের ছিল, সে খোঁচা খেয়ে হেসে উঠল—'মোটেই বোঝেন নি। পরামর্শ গুরুগম্ভীরও নয়—জরুরীও নয়। অমন ফলারটা মাটি করে ফেলব ভেবেছেন!'

মমতা হাসি থামিয়ে বলল—'কাজের কোন কথা হলে বলবেন বৈকি।'

'উঁহু। মোটেই নয়—তেমন ঠেকছে না। পণ্ডিত বলে কি এমন পণ্ডিতই পেলেন যে সামনে থাকবে রসদ সাজানো—আর তাই ফেলে আমরা শুধু মুখে মুখেই রাজা-উজির মারতে থাকব।' বলে আবার হাসতে লাগল।

ভাস্কর অফিস থেকে বেরিয়ে এলে গঙ্গাদাস খুশীর উচ্ছ্বাসে তার দিকে এগিয়ে গেল—'এস এস, অভিনন্দন! তুমি না বললেও আমি সংবাদ পেয়ে গেছি। মমতাই দিয়ে ফেললেন—সু-সংবাদ কিনা!'

মমতা চঞ্চল হয়ে উঠল—'কিন্তু আগে তো—'

'উঁহু, আর কোন কথাই নয়। এখন আর পিছন ডাকা মিছে। আগে ধন্যবাদ, পরে অবশ্য বিলম্বে বলার দোষ-বিচারও হবে।'

ভাস্কর কুণ্ঠিত হোল। অফিসে আচার্যদেবও এইমাত্র শিকল-ভাঙার প্রসঙ্গ তুলে আশীর্বচন জানাচ্ছিলেন। তার মেলার দুষ্কৃতি কোথাও যে গোপন থাকেনি এ সে পূর্বেই বুঝেছিল। অথচ তার অমনধারা উত্তেজনাময় ক্রিয়াকলাপে জড়িত হতে সংকোচেরও সীমা ছিল না। বিব্রত মুখে গঙ্গাদাসকে থামাতে গেল—'আগে শুনবে তো! অতি সাধারণ ব্যাপার—'

'উঁহু, থামো। যা শুনতেও এমন উপাদেয়, চিত্তে তৃপ্তিদায়ক, সে তো সাধারণ ব্যাপার নয়। বললে শুনব কেন! অবশ্য এখন বলার পরে উনি যদি—'

'আগে বলতেই দাও।'

'ছুটির পরে আমি বসি কথা শুনতে, আর ওদিকে দেরি হয়ে যাক?'

মমতা গম্ভীর কণ্ঠে বলল—'বাড়িতেও আপনার কি দরকার ছিল—বলছিলেন না?'

'তাই বলুন একবার!' বলে মমতার কথায় আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গাদাসের দৃষ্টি ওদের দুটিকে পাশাপাশি আবিষ্কার করে যেন সকৌতুকে হেসে উঠল। উভয়কে এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে সে বলল—'বন্ধুর ইচ্ছে যে ছুটির পরেও আমি এখন দাঁড়িয়ে থাকি, আর এমন আয়োজন মাটি হয়ে যাক।' বলে সে যে কোন আয়োজনের পর ইঙ্গিত করল বোঝা গেল না কিন্তু সহসা মুখ নীচু করেই অফিসে চলে গেল।

ভাস্কর চকিত হোল। গঙ্গাদাস কথা বেশী বলে, সে আনন্দ হলে উৎসাহীও অতিমাত্রায়, কিন্তু এ যেন তাই সব নয়!

একটু অপেক্ষা করে মমতা বলল—'আর কেন, ছুটি হয়ে গেছে।'

ভাস্কর তার দিকে চকিত হয়ে চেয়ে মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

গঙ্গাদাস অফিসে ঢুকে আশ্চর্য হোল। আচার্যদেবকে বিশুদ্ধভাষী যতীবন্ধু বলছিলেন কিছু, সে ঢুকতেই তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

আচার্যদেব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হোল?'

যতীবন্ধু মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে বললেন—'না আর কিছু নয়। এই সব জন্যে অনুভূত হচ্ছে যে কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন ডাকা আশু প্রয়োজন।'

'বুঝলাম না। দরকার হলে ডাকবেন বৈকি। কিন্তু প্রস্তাব কি, সেটাতো আগে ঠিক—'

'এ-তো ঠিক যে আমাদের নভাংশের পতন হয়েছে?' যতীবন্ধু বললেন—'বিশেষত মৃৎবিভাগের! অধিকন্তু আশ্রমের বালক-বালিকাদের সম্মুখে কি-প্রকার আদর্শ আমরা স্থাপিত করব—নর-নারীর কতটা

পর্যন্ত মেশামিশি আমরা অনুমোদন করব, সেটাও অবিলম্বে স্থির হওয়া প্রয়োজন। তার কারণও ঘটেছে।'

গঙ্গাদাস সই করতে করতে তাকালে উভয়ের চোখাচোখি হোল।

আচার্যদেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—'বুঝেছি। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাণধর্মেই তো ওরা আকৃষ্ট হয়েছে।'

যতীবন্ধু বললেন—'ঘৃতকুম্ভ এবং অগ্নি পাশাপাশি স্থিত হলেই বিনাশ, বিশেষত সংগঠন-কার্যে। বিধাতার বিধান তো প্রতিপাল্য?'

'সেই বিধাতাও যে অর্ধ-নারীশ্বর। না-না যতীবন্ধুবাবু—এ নিয়ে মিছে আলোচনার মতো কিছু হয়নি।' বলে আচার্যদেব কাগজে মন দিলেন।

যতীবন্ধু তবু কিছুক্ষণ বসে থেকে মুখখানা মেঘ করে উঠে চলে এলেন, শাস্ত্র-বাক্যে সর্বক্ষেত্রেই তার প্রত্যয় আছে মনে হোল না।

৬

ভাস্কর ও মমতা অপেক্ষাকৃত মৃদুপদে গৃহে ফিরছিল। দু'জনে একস্থানে কাজ করলেও এক সঙ্গে কাজে গেছে এমন কদাচিৎ ঘটেছে, কিন্তু ফেরবার পথে দু'জনের এক সঙ্গে আসার উদাহরণ বিরল ছিল না। পথ কিছুটা একত্র হলেও শহরের আগ থেকে দু'ধারে গিয়েছিল—ডান দিকের পথ ধরলে মমতার পক্ষে সোজাও হোত। কিন্তু দু'জনে একবার একত্র হলে একই পথের শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভাস্করের স্টুডিয়োতে কিছুক্ষণ না কাটিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে তারা বিদায় নিত না। শুধু তাই নয়, জনবিরল সমগ্র পথ তাদের নানা আলোচনার ও মন বিনিময়ের সাক্ষী

হয়ে থাকত। অন্যান্যের মধ্যে পথের এই একত্র চলাটুকু তাদের সম্বন্ধকে নিবিড় করে তুলেছিল।

কিন্তু আজ তেমন লক্ষণ ছিল না। ভাস্কর অপেক্ষাকৃত নীরব প্রকৃতির বলে কথার সূত্রপাত বরাবর মমতাই বেশী করত। কিন্তু আজ তার মন আসন্ন আয়োজনে এমন পরিপূর্ণ ছিল যে সে একপ্রকার নিঃশব্দেই চলতে লাগল। ভাস্করও কথা তুলল না। কথার সূত্রপাত সচরাচর সে করেও না, অপরের নীরবতাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি—বরঞ্চ স্বভাব-বিরুদ্ধ বলে বিশেষ করে চোখে পড়েছিল। তাই, একটা সরুপথ দিয়ে অত্যন্ত পাশাপাশি চলতে চলতে একজন যখন নীরব হয়ে থাকল, অপর তার সেই নিঃশব্দতার হেতু বুঝতে অনেকখানি দূর পর্যন্ত নেড়েচেড়ে বিচার করে বিমনা হয়ে হেঁটে চলল।

নিজের কাজ ভিন্ন যাবতীয় ব্যাপারে যত অন্যমনস্কই হোক, ভাস্কর নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল—মমতার আপাত গম্ভীর মুখের নীচে মনে মনে কিছু একটা ঘটে চলেছে। সেটা গোপনীয় হোক বা না হোক, সে ভাস্করের কাছে প্রকাশের জন্য বিন্দুমাত্র প্রয়াসীও নয়।

সকালের চিঠির পর থেকে এই ব্যবহারের সূত্রপাত, তা সে জানত। চিঠিতে প্রেরিকার নাম পড়ে মমতার যে-ক্ষোভ ভাস্কর তা নিজের চোখেই দেখেছিল, আবার—ভাস্কর যাবে না শুনে উল্লাসও মমতা কিছুমাত্র গোপন করেনি। চাপরাসীকে চিঠির উত্তর নিজের মুখে দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি—ভাস্কর যাবে না একথা পুনরায় তাকে দিয়ে বলিয়ে তবে সে নিরস্ত হয়েছিল। ভাস্কর এর কোনটাতে আপত্তি করেনি —করবার কথা মনেও ওঠেনি, তবু মমতার নিঃশব্দতার কারণ কি সে বুঝতে পারল না। অবশেষে, গঙ্গাদাসেরই কথাগুলো! ভাস্কর যতই

ভাবছে তার কাছে অস্পষ্ট ঠেকছে কিন্তু মমতার কাছে সেগুলি তেমন অস্পষ্ট বলে মনে হোল না।

এ-ধরনের সমস্যা জীবনে পূর্বে আসেনি, কিন্তু একবার যখন প্রবেশ করল—নীরোগ দেহে প্রথম রোগের ছোঁয়াচের মতো আপন বেগে অতি-দ্রুত বেড়ে চলল।

অভিন্ন পথটুকু নিঃশব্দে কাটিয়ে আসবার পর সহসা পথের দিকে নজর পড়ায় মমতাই কথা বলল। একটু চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল 'চান করেননি দেখতেই পাচ্ছি, শরীর ভাল আছে তো?'

কুশল জিজ্ঞাসা করলেও তার কথার মধ্যে এতটা পথ নীরবে আসার সকুণ্ঠ লজ্জাকে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসই প্রকাশ পেল। কিন্তু ভাস্কর উত্তর দিল সম্পূর্ণ গম্ভীর স্বরে—'সুস্থ শরীর তো এমন কিছু নয় যার সংবাদে ও-বেলা এ-বেলায় রকম-ফের হবে।'

মমতা বুঝল। তার এতক্ষণ ভাবনায় ডুবে চুপ করে থাকা যে ভাস্করকে ক্ষুব্ধ করেছে এতে সে লজ্জিতও হোল—একপ্রকার আনন্দও পেল। বলল—'না হলেই ভাল। সেই দাগটা দেখবার পর থেকে এমন মুসড়ে আছি—সারাদিন থেকে থেকে কয়েকবার মনে পড়েছে। কোন উপসর্গ তো নেই—কাউকে দেখাবার দরকার নেই?'

ভাস্কর উত্ত্যক্ত স্বরে বলল—'এক কথা কবার বললে তবে আমায় বলতে পার!'

ভাস্করের মুখের দিকে চেয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মমতা চুপ করল। অন্যের উত্তাপের হেতু তার নিকট অগোচর ছিল না। তার নিজেরই আচরণ যে ভাস্করের কাছে ক্রমাগত দুর্বোধ্য মনে হওয়া অসম্ভব নয়, মমতা জানত। তাই যেমন সে ক্ষুব্ধ হোল না তেমন আর কথাও বলল না।

ভাস্কর কয়েক পা গিয়ে বলল—'বরং অন্য কথা ভাবি।'

মমতা এরও কোন জবাব দিল না। মনে মনে বলল—একবার বাড়ি থেকে হাজরে দিয়ে আসি, তারপর দেখব এ-রাগ কোথায় থাকে।

কিন্তু আজীবন যার মাটি নিয়ে কারবার মনের এই লুকোচুরি খেলার সঙ্গে পরিচয় তার বেশী ছিল না। থাকলেও অন্যের মনের ভাবনা বোঝবার কথা নয়।

মমতা আরও একটু নিঃশব্দে হেঁটে চলে সেই মোহনায় পৌঁছে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল—'আমি এই পথেই যাই।'

ভাস্কর বিস্ময়াপন্ন হয়ে তাকাল। মমতার আজকের আচরণ পূর্বের সাথে যতই অমিল হোক সে এতখানির জন্যেও প্রস্তুত ছিল না। বলল—'আজ স্টুডিয়োতে যাবে না?'

মমতা বাড়ি হয়ে সেখানেই যে যথাশীঘ্র আসবে বলে এই পথ ধরেছে সে-কথা গোপন করল। প্রশ্নের সোজা উত্তর এড়িয়ে বলল—'এখন থাক।' কিন্তু ভাস্করের মাথার দিকে নজর পড়লে সে যেন সাবধান করতেই না বলে পারল না—'চান হয়নি, শরীর কেমন আছে বললেন না—দেখবেন যেন রাস্তায় কোথাও দেরি করবেন না!'

ভাস্কর তার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল, কথা বলল না।

মমতা যেন তাকে স্বাস্থ্যভেবে সাবধান করতেই আবার বলল—'কথা দিয়েছেন মনে আছে তো—বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যাতেও আজ কোথাও যাচ্ছেন না?'

ভাস্কর ঘাড় নাড়লে মমতা দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

পথের নিকটস্থ বাঁকে তার চলন্ত চেহারা অদৃশ্য হোল বটে কিন্তু সুরকির কাঁকরে তার স্যাণ্ডেল ঘষে হেঁটে চলার শব্দটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। ভাস্কর ধীরে ধীরে গভীর কুয়াশার মধ্যে আলো

পেয়ে দেখতে পেল যেন—সে মমতার চিত্তবিক্ষেপের কারণ যেন বুঝতে পেরেছে।

অবশিষ্ট পথটায় তার পায়ের গতি ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। গৃহে পৌঁছলেই সাড়া পেয়ে সনাতন উপস্থিত—হাতে উনুনে ফুঁ দেবার নল, মাথায় গামছা জড়ান, ভাস্করকে একলা দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'উনি এলেন না?'

'স্টুডিয়ো খুলে দে।' ভাস্কর উত্তর দিল।

সনাতন বিস্ময়াপন্ন হোল। কারণ ভাস্কর আশ্রম থেকে ফিরে আসবার পর একমাত্র এই সময়ে কিছুক্ষণ স্টুডিয়োয় যেত না। সে শিকল খুলে কপাট ঠেলে দিল, বলল—'জলখাবার আনি?'

'হুঁ' বলে ভাস্কর অন্যমনস্কের মতো ভিতরে চলে গেল।

এতক্ষণ পর্যন্ত অনন্তবেগে চলে আসবার উদ্দেশ্য যেন তার নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। একটা আহত আত্মবোধের তাড়নায় কোথাও সে থামতে পারেনি। এই তাড়ানাই তাকে আপন পরিবেশের মধ্যে চৌকিতে এনে বসিয়ে দিল। কিন্তু সিংহের গ্রাসে রাখা চিঠিখানার পর নজর পড়লে তার চোখ-দুটো সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল—আবার যেন দেখতে পেল, মমতার চেহারাটা সুরকির পথের উপর শব্দ করে করে সুমুখের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে। যা অস্পষ্ট ছিল নিমেষে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উঠে গিয়ে চিঠিখানাকে একবার পড়ল, দু'বার পড়ল, তারপরই নিমন্ত্রণলিপি মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'কেন যাব না? এর মধ্যে দোষ কোথায়?'

লোচনের হাতে খাবার এবং নিজের হাতে জলের গেলাস নিয়ে সনাতন যখন এসে ডাকল—'দাদাবাবু!'---দাদাবাবু কোথাও তখন নেই। উভয়ে বিস্মিত হলেও টুল টেনে খাবার রাখল। জলের গেলাস ঢাকা

দিল। লোচনকে গিয়ে বাকি রান্নায় নজর দিতে বলে সনাতন অপেক্ষা করতে লাগল। যাকে স্টুডিয়োতে একবার ঢুকলে নড়াবার জন্যেও সাধ্যসাধনা দরকার হয়, সে-যে আপন গরজে কারও নিমন্ত্রণ রাখতে ছুটেছে এ ওদের ভাবনায় এল না। তারা কোথাও যাবার কথা ছিল বলেও শোনেনি। চান-ঘর কি আর কোথাও গিয়ে থাকবেন।

লোচন যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বলল—'দাদাবাবু লুচির পাতে পায়েস ভাল খান, না সোনা-দা?'

সনাতন হাসল একটু। তা-ই আজ বিকেলের খাবার ছিল বটে। সন্ধ্যার জন্য যে-আয়োজন তা থেকেই অল্প অল্প তুলে এনেছিল।

লোচন চলে গেলে সনাতন অপেক্ষা করতে লাগল—অপেক্ষা ক্রমে দীর্ঘ হতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন মমতা এসে উপস্থিত হোল সনাতন তখনও অপেক্ষা করে ছিল। সে এই দীর্ঘ-সময়ের মধ্যে কেবল স্থান বদলেছিল এবং স্টুডিয়োর বাইরে এসে বারান্দার থামে শ্রান্তের মতো পিঠ রেখে বসে ছিল। সন্দেহ ছিল না ভাস্কর বাইরে গেছে, কেবল কোথায় গেল—বুঝতে পারেনি।

কত ব্যবস্থা সারতে তখনও বাকি, মমতা তাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল। সনাতনকে তদবস্থ দেখে বলল—'বুড়োমানুষ, তোমাকেও আজ অনেক কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু এ-খাটনিতে আনন্দ আছে—না সনাতন?'

সনাতন মুখ নামিয়ে রইল।

মমতা হাতে করে থলের মতো ঝুলিয়ে আনা কয়েকখানা আসন বাড়িয়ে বলল—'নিয়ে রাখো গিয়ে। সংগ্রহ করতে হোল। কাঁটালের কাঠের ওই সব মেঝে-জোড়া সেকেলে পিঁড়ি—ফি-বারেই দেখি বসতে ওঁদের অসুবিধে হয়। ভাল হোল, না?'

সনাতন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল—'কি বলব বলো ?'

'কি হয়েছে সনাতন ?'

সনাতন মুখ নামিয়ে ক্লিষ্টস্বরে বলল—'ভালই হয়েছে।'

'বলবে তো আমাকে !'

মমতাকে বিস্ময়ে অভিভূত দেখে সনাতন বলল—'দাদাবাবুকে দেখতে পাচ্ছিনে।'

'সে কি ? কোথায় গেলেন ?'

'জানিনে।' সে মমতার হাত থেকে আসনের বাণ্ডিলটা নিয়ে উঠে চলে গেল।

স্টুডিয়োর দরজা খোলা। টুলের উপর খাবার জলের গেলাস সব তেমনই পড়ে ছিল। মমতা স্টুডিয়োয় ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কোনটাই সনাতনের কথা মিথ্যা বলল না। ভাস্কর তবে গেছে। সিংহটার গ্রাসের দিকে তাকিয়ে রইল—চিঠিখানা নেই। কিছুই তার অজানা থাকল না।

এমন সময় শুনতে পেল ঊর্মিলা প্রাঙ্গণের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকছে—'লোক নেই, আলো নেই—নেমন্তন্নের নামে ডেকে এনে গৃহস্থই হাওয়া নয় তো! কই মমতা! কই গো উদ্যোগিনী!'

মমতা আঁচলে মুখ মুছে এগিয়ে এল।

ঊর্মিলা দেখতে পেয়ে বলে উঠল—'বেশ সব! কই—ভাস্করবাবু কোথায় ?'

ভাগ্য যে আবছা-আঁধারে মুখের চেহারা বোঝা যায় না, মমতা হেসে বলল—'আয়, আগে বোস্।'

৭

রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই ভাস্করের মনে হোল, পথ সে ঠিক [illegible] এবং বাঁকা পথ একপ্রকার পিছন-টানের মধ্য দিয়ে চলে এসেছিল। কিন্তু 'লালকুঠি'র ফটকে পৌছলে দ্বারী যখন তার বেশভূষার পর দৃষ্টি ফেলে নাম-ধাম চেয়ে বসল একমাত্র তখনই সে স্থির-নিশ্চয় হোল যে ভুল করেছে। একে তো এ-রকমের চা-আসরে সে পূর্বে আসেনি, তার উপর দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম সে এমন কোথাও এসেছিল যার সম্বন্ধে মমতা জানে না নয়—যেখানে আসায় তার ইচ্ছা ছিল না।

ভাস্কর দ্বারীর দেওয়া কাগজ-পেন্সিল ফিরিয়ে দিল। চলে আসছে এমন সময় দূর থেকে পাঁচুর বিস্মিত দৃষ্টি তার প্রতি কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল। সে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল—

'বাবু আপনি!'

'[illegible]কালে তুমি গিয়েছিলে, না?'

'হ্যা, বাবু। এই মহারাজ—আরে এ তুম্ কেয়া করতা হায়—সরো সরো, এখনি পথ ছাড়ো!' বলে পাঁচু এমন সোরগোল সুরু করল যে মোহভঙ্গে বে-সামাল মহারাজ নিমেষে টুল-সিংহাসনের দখল ছেড়ে উঠে তো দাঁড়ালই, পরন্তু এই কুঠির যারা নিয়মিত অভ্যাগত সেই সাহেব-সুবাদের বাজারে ওই দেখতে সাধারণ লোকটা যে কি দরের তা আন্দাজ করতে না পেরে একবার শুষ্ক মুখে তার দিকে একবার অন্দরের দিকে তাকাতে লাগল।

পাঁচু ভাস্করকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

কৃষ্ণা গুপ্তা ভাস্করের না-আসাই ধরে নিয়েছিল। অল্পসল্প কয়েক-জনের সঙ্গে বসে গল্প করছে, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচুর পিছন

পিছন ভাস্কর... আসতে দেখে অভিনন্দনের সীমা রাখল না। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো কোলের কুকুরটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিয়ে এমন চোখের পলকে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল যে, সে-ক্ষিপ্রতা সচরাচর দেখা যায় না। সম্ভবত ভাস্করের পর তার অতিশয় আগ্রহই সে দেখাতে চাইল। ইতিমধ্যে মুখমণ্ডলে অতিথির জন্য রাশীকৃত বিস্ময় এবং বিমুগ্ধতাও সে জড়ো করেছিল। দ্রুত এগোবার অবসরে বাদামী শাড়িখানার পরে হাতটাও একবার বুলিয়ে নিল।

ভাস্কর সেদিনের মোটর-আরোহিণীকে এক নিমিষে চিনল, 'কৃষ্ণা গুপ্তা'ও অচেনা রইল না। উভয়কে হল-ঘরের দরজায় পৌঁছলে দাঁড়াতে হোল।

কৃষ্ণার কোলভ্রষ্ট ক্ষুদ্ধ কুকুরটা চৌকাঠ থেকে মুখ বাড়িয়ে গরগর্ করছিল—ধুতি-পাঞ্জাবি দেখলেই সে অমন করতে থাকে।

'আঃ, ভেলি! নটি! যাও বলছি—যাও এখান থেকে!' কৃষ্ণা স্নেহপাত্রকে শাসন করে ভাস্করের দিকে চেয়ে একবার হাসল।

ভেলি নিস্পৃহের মতো কয়েক পলক চেয়ে থেকে দুয়ারের পাশে সরে দাঁড়ায়।

ভাস্করের হলে ঢুকে চারদিক চেয়ে প্রথম কথাই মনে পড়ল—'এমন স্থানে এই প্রথম এলাম!' অথচ অতি নিকটে, বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয়—এমন কথাও মনে না হয়ে গেল না।

'চলুন বসবেন।'

'হুঁ, চলুন।' বলে ভাস্কর কৃষ্ণার অনুসরণ করল।

হল ঘর বেশ প্রশস্ত, অনেকগুলি জানলা দরজা। পথে। দিকের দেয়াল থেকে দুটো অর্ধ-বৃত্তাকার অলিন্দ বেরিয়ে ঘর ও বাইরের সমান করেছে। কাচের কপাট ঝালর-পর্দা কোথাও বসতি নেই। আঁধার

গাঢ় না হতে দুই দেয়াল থেকে ছুটো বেশী শক্তির আলো আলায় ঘরের মধ্যে উৎসবের-পরিবেশ রচনা করেছিল।

ভাস্কর দেখল—ঘর-জোড়া কার্পেটের উপর নানা আকারের টেবিল, নানা প্রকারের চেয়ার সোফা সাজানো। দু'তিনটে দলে বিভক্ত নিমন্ত্রিতেরা তার কতকগুলি জুড়ে গল্প করছেন। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ওরা যে প্রবেশ করল তা সবারই লক্ষ্যে পড়ল কিন্তু কেউ বিশেষ কৌতূহলও দেখালেন না।

কৃষ্ণা বলল—'মাসীমা, আসুন পরিচয় করিয়ে দি।'

এ-আহ্বানে অপেক্ষাকৃত যে বর্ষীয়সী মহিলা গলা উচ্চে তুলে চক্রাকারে বসা অল্পবয়স্কাদের কাছে গল্প করছিলেন—যেন তিনিই প্রধান অতিথি—তিনি থামলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত। নব্য ফ্যাশানের নিরাভরণাদের মধ্যে তাঁর স্থূল দেহের মোটা মোটা গহনার পর নজর না দিয়ে তাঁকে দেখা যাবে এমন উপায় ছিল না।

কৃষ্ণা একে একে সবার সঙ্গে ভাস্করের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। ভাস্কর গুণী, ভাস্কর তরুণ এবং রূপবান। শুধু তাই নয়, যে-উপলক্ষে তার আহ্বান তাতে সে 'হিরো'র পর্যায়ভুক্ত। সকলে পরিচয় স্থাপনে আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে অগ্রসর হলেন। তথাপি কেউ কেউ যে মুখে চেষ্টাকৃত নিরাসক্তির ভাব ফুটিয়ে রাখলেন এবং অপরে বিগলিত কৃতার্থ-ভাব ফুটিয়ে তুললেন সে দুই-ই এখানকার নিয়ম বলে।

শিক্ষিতাদের একজন হিসাবে রুচির দিক থেকে কৃষ্ণা গুপ্তার কাছেও এ-সব বিতৃষ্ণাদায়ক। কিন্তু সে অভ্যাসের তরফ থেকে উচ্চ-পদস্থ ফ্যাশানবিদ্-দের সম্মানীয় অতিথি হিসাবে পাবার লোভ ছাড়তে পারে না। তা'ছাড়া সে দীর্ঘকাল 'পার্টি' না দিয়ে থাকাকেও আদব বলে বিবেচনা করে না। শৈশব থেকে গভর্নেসের হাতে মানুষ।

আজও ঘরে-ভবনে সুই অভিভাবিকা। বাপ অবন গুপ্ত সদ্য বদলি হয়ে এখানে এসেছিলেন, বিপত্নীক সাহেব মানুষ—আদালত আর তৎসম্পর্কিত কাজ ছাড়া উদ্বৃত্ত সময় কাটান ক্লাবে-ক্লাবে। কৃষ্ণা গুপ্তা তাই নির্বান্ধব অপরিচিত জায়গায় জনপ্রিয় হবার উপায় হিসাবেই 'পার্টি' দেওয়াকেই বেছে নিয়েছিল। সে উপলক্ষের জন্য কখনও অনুতাপ করে না।

কৃষ্ণা ভাস্করকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। শান্ত ঔৎসুক্যের মধ্যে কিছুক্ষণ কেবল কতকগুলি নাম ও সহাস্য নমস্কারের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

ভাস্কর স্মিত-মুখে একে একে প্রতি-নমস্কার করছিল। তবু বিচিত্র মানুষের মন—তখনই তার মনে মনে একটা ব্যগ্র মুসাবিদার কাজও চলেছিল: সে দেখা হলে এখানে আসার যুক্তি হিসাবে মমতাকে কি বলবে? সে আসল-ই যদি তবে শেষ মুহূর্তেও তার প্রশ্নের উত্তরে তাকে কেন না বলেছিল? 'জানিনে' সে অকপটেই বলেছিল কিন্তু এখন মমতার এক বিষণ্ণ মূর্তির সামনে সে যে সত্য-সত্যই কৃষ্ণা গুপ্তাকে চিনত না—এ-কথা যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদন করবার জন্য এমন মগ্ন হয়ে রইল যে, নিমন্ত্রিতদের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে নমস্কার ভিন্ন অন্য কোন আলাপই আর করতে পারল না।

কৃষ্ণা পরিচয়াদির পর যখন একটা সোফা দেখিয়ে তাকে বলল—'বসুন', সে দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়ল। সৌজন্যসূচক কোন উক্তিই তার মুখ দিয়ে বের হোল না। কেবল হলের চতুর্দিকে অলস ভাবে চোখদুটো একবার চালনা করে দিল।

কৃষ্ণা অতিথিদের সম্ভাষণ করে বলল—'আপনাদের জন্যেও আর একবার চা বলে দি? আশা করি কারও তাতে আপত্তি হবে না!'

'একটু হবে বৈকি!' ভারি মোটা গলায় যিনি আপত্তি করলেন এতক্ষণ একা-ই তিনি একখানা টেবিল জাঁকিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন। মাথাভর্তি টাক, যেমন মোটা তেমন বেঁটে, টেবিলখানা কোলের কাছে থাকায় দেখাচ্ছিল যেন কেবল থুতনির 'পরে বসান একটা গোলাকৃতি মাথা টেবিলে রাখা আছে।

উপস্থিত প্রায় সবাই চমকে সেদিকে তাকালেন। মাসীমা অবাক হয়ে থেকে বললেন—'মানুষকে এমন অপ্রস্তুতও করতে পার!'

উভয়ের মধুর সম্পর্ক কারও অজানা নয়। কিন্তু গৃহিণীর অনুযোগের মান রাখলেন না 'মেসোমশাই'। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে বললেন—'হ্যাঁ—তবে এক কথা—ওই সঙ্গে কিছু সিদ্ধ এবং গরম-ভাজা চালান হয়ে এলে আর আপত্তি থাকে না। এ-কথা ডেলিও মানবে।'

ডেলি নিজের নাম শুনে লেজ নাড়তে লাগল। সে মনিব পরিত্যক্ত হয়ে এতক্ষণ টেবিলের অদূরে সামনের দুই থাবায় ভর দিয়ে নিশ্চলবৎ বসে ছিল।

তখনও মেসোমশায়ের টেবিলের উপর কয়েকখানা শূন্য প্লেট পড়ে, সবাই হাসতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর গোলাকার মুখ-চন্দ্রে পরিহাসের ফিকে জ্যোৎস্নাও প্রকাশ পেল না। কৃষ্ণা হেসে বলল—'আমিও বলছি আপত্তি থাকে না! বেয়ারা!'

'জী, হাঁ।'

'চা-খাবার—আচ্ছা, আমি আসছি।' বলে কৃষ্ণা মাসীমার দিকে তাকিয়ে বলল—'মাসীমা, কথা কিন্তু এখনও আপনার শেষ হয়নি!'

মাসীমা এ ইঙ্গিত গ্রহণ করলেন। ভাস্করকে কেন্দ্র করেই আলোচনা হোক—এ ইচ্ছা সবার মনে ছিল, তবু সকলে মাসীমার প্রতি মনোযোগীও হোল। নবাগতের সমুখে বলে ঈষৎ সংকোচ এক-প্রকার

উৎসাহ পেয়ে মাসীমা বললেন—'বরঞ্চ এ-কথা মানতে হবে আমাদের সঙ্গে সত্যের যুগ তবুও কিছু পত্তন হয়েছে। মন যখন সোনা চায় মুখেও আমরা সোনা-ই চাই। দুঃখ-দুর্দশা-রসাতল বলে চেঁচাই নে, কারণ অভাব আমাদের নেই। মিথ্যে অন্যের দুঃখে কাঁদতে বসলে কান্না আসবে কেন!' একটু থেমে মাসীমা বললেন—'তবু আমাদের পুঁথি-পত্রে আগের কালের ইতিহাসের যে-সব কথা আছে গুরুকে তা বলেছিলাম। তিনি বললেন—আগের কালের কিছুও কি আছে—ভাঙা স্তূপ, পাথরের টুকরো, মরা নদী ছাড়া! ইতিহাস যে মরে গেছে বলেই ইতিহাস—তাদের জীবিত থাকা আর উচিত ছিল না বলেই তারা মরে গেছে। তাদের কথাকে মরা থেকে টেনে এনে যতবার প্রাণ দাও না কেন, প্রথম প্রথম কয়েক দিন চাঁদা উঠবে—তারপর আর উঠবে না। বোঝ না কেন—আগের কালই যে নেই!'

'আছে কাঁধে বেহ্মদত্যি হয়ে।' বলে কে একজন হেসে উঠল।

'নাও চা এসে গেছে।'

কৃষ্ণাও এল চা-খাবারের পিছন পিছন। মাসীমা থেমেছিলেন, মেসোমশায়ের রসনা উঠল ব্যস্ত হয়ে।

ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে গেল। আলোচনার আদিতে তার হাসি এসেছিল, সে নিজেকে নতুন ভেবে হাসেনি। এখন যে সবার সঙ্গে হাসতে পারল না, তারা ভাবল—সে নতুন এল বলে। ওর এখানে আসার আগে এ প্রসঙ্গ না উঠলে ভাস্কর ভাবতেও পারত, এ-সব আলোচনা তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু এ-যে তা নয়, একে যে এঁরা সত্যি বলে বিশ্বাস করেন এবং তাও আবার নানা প্রকার যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে—এও যেমন সে সন্দেহ করল না, তেমন এঁদের সব কথাই যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় এমনও ভাবল না।

মাসীমার আলোচনা চা এসে পড়ায় সাধারণ আলোচনায় দাঁড়িয়েছিল। অনেকেই অল্প-বেশী অংশও গ্রহণ করছিলেন।

ভাস্কর কুণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এদের এই ধরণের সঙ্গে সে যে একেবারে অপরিচিত তা নয়, কিন্তু মন তার কোনদিন আগ্রহপূর্ণ ছিল না। সে-সব পরিচয়ও ছিল সমগ্র বক্তব্য থেকে কেটে নেওয়া ছাড়া-ছাড়া উক্তির মতো। এই ঘরে এই আবেষ্টনীর মধ্যে বসে এমন করে না দেখতে পেলে যেন কোন দিনই বিশদ হোত না।

এমন সময় দুয়ারের কাছে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কৃষ্ণার গভর্নেস মিস্ পাউয়েল মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন—'বেবি!'

কৃষ্ণা ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, অবন গুপ্ত সান্ধ্য পোষাকে হলের ভিতরে চলে আসছেন। নিয়মিত ক্লাবে যাবার আগে মেয়ের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে (এবং নিমন্ত্রণ প্রায়ই লেগে থাকে) একবার ঘুরে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধে হলেও দেহের সুন্দর দীর্ঘ গঠন, অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক সেটা দেখলে বোঝা যায়। ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের কেস্‌টা টানতে টানতে ছুটির মেজাজে এগিয়ে আসছিলেন।

কৃষ্ণা ভাস্করকে বলল—'আসুন বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

ভাস্কর মনে মনে বিব্রত হয়ে উঠল। এখানে শ্রদ্ধা জানাবার সহজ প্রকাশ কি হওয়া উচিত সে ভেবে পেল না। এই পরিবেশে প্রণাম যে অচল সে নিজেই বুঝেছিল।

সংকট মোচন করলেন অবন গুপ্ত নিজে। পরিচয় দেওয়া শেষ হলে তিনি সহাস্যে বললেন—'গুড্ ইভ্নিং, গুড্ ইভ্নিং!' তারপর কেস্ থেকে সিগারেট নিতে নিতে ভাস্করের দিকেও একবার বাড়িয়ে ধরলেন।

ভাস্কর কুণ্ঠিত মুখ নামিয়ে বলল—'আমি খাইনে।'

'ভাল অভ্যাস—না খাওয়া।' অবন গুপ্ত অপ্রতিভ না হয়ে এবং না করে অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন—'কিন্তু ওটা চলে তো? চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' ভাস্করের বেশ-ভূষা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

ভাস্কর লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল।

কৃষ্ণা বলল—'কিন্তু ভাস্করবাবুর প্রধান পরিচয় যে—'

বাপ কথার মাঝেই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন—অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণার বেছে বেছে পছন্দ করার অনেক উদাহরণ জানেন। এ নিয়ে তার মনে একটা সস্নেহ ভাব ভিন্ন আগ্রহ-অনাগ্রহ কোনটা-ই ছিল না। অন্যান্য অতিথিরা সবাই চেনা। অবন গুপ্ত কাউকে মাথা হেলিয়ে কাউকে 'গুড্ ইভ্নিং' জানিয়ে সম্ভাষণের পালা সেরে চলে গেলেন।

ভাস্কর তাঁর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল—অত্যন্ত সপ্রতিভ গতিশীল এখানকার আবহাওয়া। সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক এখন সহজ বলে আরও সেটা চোখে পড়ল।

অপেক্ষমান পাঁচু ডাকল—'দিদি-সাহেব।'

'খাবার? চল, যাচ্ছি।' কৃষ্ণা চলে গেল।

ভাস্কর সচরাচর চা খায় না। কিন্তু উপস্থিত দুটো কারণে খাওয়াই সে সিদ্ধান্ত করল। প্রথমত না খেলে তাই নিয়ে যে গুঞ্জন কিংবা প্রশ্নোত্তর উঠতে পারে তা সে স্থগিত রাখতে চায়। দ্বিতীয়ত পথে আসতে এবং এখানে পৌঁছেও মনের মধ্যে যে সংশয় বা বিরূপতা ছিল এখন আর তেমন কিছু অনুভব করছে না। বরঞ্চ তার শিল্পী-মন এখানকার যে পরিপূর্ণ রূপ দেখেছিল সে তার উপর এক প্রকার আগ্রহ-ভাবই পোষণ করছে। ভ্রান্তি সরিয়ে রেখে সেটাকে সে ভেবে দেখতে চায়।

ভাস্কর কাপে চুমুক দিল। মুখ তুললে, দেখতে পেল দেয়ালে ছড়ি-টুপি রাখবার র‍্যাকের সাথে যন্ত যে-আয়নাখানা ছিল তার মধ্যে তাকে সমেত সমস্ত পরিবেশের ছায়া পড়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তার মধ্যে নিজেকেই নিজে দেখলে কেমন হয়! সে চকিত হয়ে চেয়ে রইল।

'কৃষ্ণা গুপ্তার নিউ ফাইণ্ড, নতুন শিকার!'

কৃষ্ণা খাবারের ট্রে তদারিক করে ফিরে আসছিল, সহসা চাপা আলাপে নিজের নাম কানে যাওয়ায় পর্দার পাশে থমকে দাঁড়ায়।

'কৃষ্ণা গুপ্তার নতুন শিকার! আর কি ওকে ছাড়বে?' সে রেণুর গলা স্পষ্ট চিনতে পারল—'বেচারী নোবীনের জন্য দুঃখ হয়।' রেণু একটা কৃত্রিম নিঃশ্বাসও ফেলে।

একটু থেমে আবার বলল—'একটা মোটা রকমের ফুলের মালা জোগাড় নেই বলে ওর বুক আজ ফেটে যাচ্ছে—বাজি রাখতে পারি।'

কৃষ্ণা বুঝল বক্ষদেশটি তারই, কিন্তু সেটা চৌচির হবার পরিবর্তে নিমেষে তার চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল। শুনল শাশ্বতী বলছে—'কিন্তু এঁকে যে আমি চিনি।'

'চেন? কই সে-রকম তো—উনিও তো কোন—'

'চিনি।' শাশ্বতী বলল—'কিন্তু ঠিক এঁকে নয়। এঁর পূর্ব-পুরুষদের। তাঁদের কীর্তি-কলাপ বাবার কাছ থেকে শুনেছি—ঠাকুর্দা তো এখান থেকেই পশ্চিমে যান কিনা। আমরা বছরে তাই একবার করে পুরানো ভিটেয় আসি। এঁরা রাজা ছিলেন বলতে পারিস।'

'হলে কি হয়!' রেণুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এবার যেন আন্তরিকতাও মিশল—'কৃষ্ণা কি ডাক-সাইটে, বাপ্‌!'

"হোক। কিন্তু এখানে দাঁত বসাতে এলে কৃষ্ণার মুখও কালো হবে

—বলে রাখছি। এ পুরানো বংশের শিকড়—নাড়ানোই একে যায় না, তা খেলানো! ভেবেছে বুঝি—'

কৃষ্ণার মুখের উপর দিয়ে আবার অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। খাবার নিয়ে বাবুর্চি এসে পড়ায় তাকে নিয়ে হলে আসতে হোল, কিন্তু তার হাব-ভাবে কিছু শোনা তো পরের কথা সে কিছু শুঁকেছে বলেও প্রমাণ ছিল না। কেবল পূর্বের চেয়ে উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতে ভাস্করের দিকে এগোতে এগোতে বলল—'বসিয়ে রেখেছি তো!'

বাবুর্চি একে একে টিপয়ে খাবার রেখে গেল।

ভাস্কর কুণ্ঠিত হয়ে উঠল—'অনেক যে, এত কি হবে!' সে এ-রকমের খাবারেও যে অভ্যস্ত নয়, লজ্জায় একথা বলতে পারল না।

শুনে কৃষ্ণা ভ্রূ বাঁকিয়ে এমন করে হাসল যে, যেন অত্যন্ত কৌতুক-জনক কিছু শুনেছে। বলল—'বারে, তবে আর আপনি কেমন বীর-পুরুষ! আগে বসুন তো।' বলে সে একটু এগিয়ে যখন নিজেও সেই স্বল্প-পরিসর সোফার প্রান্তে বসে পড়ল, ভাস্কর আর শব্দ করল না।

কৃষ্ণা টি-পট হাতে নিলে তার চোখ দুটো যে মুহূর্তের জন্য ছুটে গিয়ে রেণু-শাশ্বতীর মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে এল, সে যেন শুধু অন্যমনস্ক-ভাবেই। 'বীরপুরুষে'র সূত্র নিয়ে সে বলতে লাগল—'সত্যি, কাল আমার এক-একবার এমন ভয়ও হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল—এই বুঝি শিকল না ভেঙে আপনার বুকই ভাঙে। কি করে ছিঁড়লেন বলুন তো!' বলে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে তার চোখ বলল—ভাস্কর, তুমি আশ্চর্য পুরুষ!

ভাস্করের আরক্ত মুখ-খানা লজ্জায় নুয়ে পড়ছিল—সে বুঝতে পারল না যে, চা ঢালতে ঢালতে কৃষ্ণার হাত তার হাতে ঠেকে যাওয়া ঐ ব্যবধানেও উচিত কি না। এ-সব ক্ষেত্রে বোঝাও সম্ভব নয়।

কৃষ্ণাকে টিপয়ের অপর প্রান্ত থেকে একটু উঁচু হয়ে চিনির পাত্রও এগিয়ে আনতে হোল। ভাস্কর সুগোপনে শিউরে উঠে অনুভব করল —সেই স্বল্প-পরিসর সোফার মধ্যে নিতান্ত অপরিহার্য বলেই কৃষ্ণার কোমল তনু তার পার্শ্বদেশে ঠেকে গিয়ে এক মুহূর্ত লেগে না থেকে পারল না। কৃষ্ণা আবার বসলে উভয়ের জানুদেশের উষ্ণস্পর্শ যে একেবারে ঘুচল না সেও স্থানাভাবে অপরিহার্য বলে।

বিমূঢ় ভাস্কর একবার আয়নাখানা দেখবার জন্য মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল—অন্তত, তৃতীয়-যাঁরা সেঘরে ছিলেন সেখানে তাঁদের মুখের আকৃতিটা?

কিন্তু কৃষ্ণা তার শিউরে ওঠা বুঝেছিল, তাগাদা দিল—'বসুন, খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ভাস্কর খাবার তুলে নিল কিন্তু মাথা ক্রমে সমুখের দিকে ঝুঁকতে লাগল। ঘরের সেই অত্যুজ্জ্বল আলোতেও সে যেন স্পষ্ট দেখছে না। বুঝেছিল, অনুরোধের আগ্রহের সাথে কৃষ্ণার জানুদেশও স্বভাবতই চেপে আসছে।

নিমন্ত্রিতেরা এক-ভাবে গল্প করে যাচ্ছেন, অসমীচীন কৌতূহল এখানকার নিয়ম নয়।

ভাস্কর খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কৃষ্ণা বলল—'লজ্জা করে খেতে পারবেন না কিন্তু! আপনি বড় লাজুক।'

অভিযোগ শুনে ভাস্কর মুখ তুলে এমন করে হাসতে গেল যেন সে কিছুতে লাজুক নয়। লজ্জা তাতে আরও প্রকাশ হয়ে পড়লে হাসি উচ্চ এবং দীর্ঘতর করে চলল। কিন্তু নিমেষের জন্য সে এঁদের এই সংস্কার-মুক্ত বৃথা-লজ্জাহীন স্পষ্ট মনের সাথে মমতার অতি-লজ্জাশীল অতি-অনুরক্ত সদা-ব্যাকুল মনের তুলনাও না করে পারল না।

সেই ব্যবধানের চেহারা ঠিক এই সময়ে তার নিজের গৃহে যেমন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তেমন সাধারণত চোখে পড়ে না।

কোথায় লালকুঠি—তার হাস্যোজ্জ্বল আলোক ভরা হল, আর কোথায় ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার ঝিঁঝি-ডাকা নিভৃত কক্ষ। মস্ত ঘরের এক কোণে কেরোসিনের আলো জ্বলছিল, তার মৃদু রশ্মি ঘরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে হয়ে শেষে অনেকেই আহারাদি সেরে প্রস্থান করেছিলেন—মুখে যে যা-ই বলুন এই পোড়ো পুরীতে সন্ধ্যার পরেও রাত করতে ভরসা হয়নি কারও। অবশেষে আলোর চারপাশে কম্বলের আসনে গঙ্গাদাস, রবি এবং পীড়াপীড়ি করায় উর্মিলাও খেতে বসেছিল। মমতা ধীরে ধীরে পরিবেশন করছিল এবং প্রতিমুহূর্তে ধরণীকে দ্বিধা হবার বাসনা জানাচ্ছিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, গঙ্গাদাস আপন মনে হেসে উঠে বলল—'পাগলা শিল্পী আর কাকে বলে, দেশশুদ্ধ খেতে ডেকে শেষে নিজেই পলাতক—কোথায় গেল, আপনাকেও কি জানিয়ে গেল না?'

মমতা হাতা নিয়ে চাটনির থালায় মনোযোগী হয়ে উঠল।

উর্মিলা হেসে বলল—'ও আর কতোবার বলবে? তিনি যাবার পরেতো ও এসেছে কিনা।'

গঙ্গাদাস গম্ভীর হয়ে বলল—'কিন্তু এতটা রাত হোল—একটা আপদ-বিপদও তো হয়ে বসতে পারে!'

'আপদও হয়নি বিপদও হয়নি। মমতা জানে না বটে ঠিক কোথায় গেছেন—কিন্তু যেখানেই যান জলে যে পড়েননি, তা কি আর নাই জানে ও! কি বলো ভাই?' বলে উর্মিলা মমতার দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। তাকে মমতা কিছুই বলেনি বটে কিন্তু সে সহজ স্ত্রী-বুদ্ধিতে অস্পষ্ট করে রহস্য কিছু অনুমান করেছিল।

মমতা ব্যস্ত হয়ে রবিকে বলল—'আপনাকে আর একটু চাটনি দি ?'

'দিন। মুস্কিল যে খেতে বসলে কখনো কাউকে না বলতে পারিনে।'

তার বলার ধরনে সবাই হেসে উঠল। গঙ্গাদাস গম্ভীর হয়ে বলল—'বুঝলাম ভয় নেই কিন্তু এই সব আত্মভোলা মানুষ নিয়ে ভরসাই বা কি ? কিছু না। দেখুন গিয়ে—হয়তো কোথায় চন্দ্রের আলোয় নৈশ-শোভা নিরীক্ষণ করছে, চারপাশে সাপ-খোপ কিংবা আর কোথাও বুক দিয়ে শিকল ছেঁড়া-ছিঁড়ি। কিছুই আশ্চর্য নয়। না না তাবলে আপনি কেন ভয় পেয়ে যাবেন ?'

মমতা শুকিয়ে উঠেছিল। অবশ্য ভয়ে নয়, কিন্তু যেজন্যে সেকথা অপর কাউকে বলতেও পারবে না।

গঙ্গাদাস বলল—'ভয় মিছে—এ ওঁর স্বভাব। দেখেছি কিনা আনন্দ-ফূর্তি, পাঁচজনে মিলে খাওয়া, কি কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া—এসব ওকে কোনদিনই টানতে পারল না। যেখানে ভিড় সমারোহ সেখানেই ও নেই। কিছু একটা করে সবে গড়ে তুলবে—এ নিয়ে নিষ্ঠা ওর শেষ হোল না।'

উর্মিলা বলল—'সবারই যদি এমন মতি হোত!' একটু থেমে বলল—এই জন্যেই আশ্রমভতি ওঁর গুপ্ত ভক্তের দল। আচার্যদেব তো ভাস্কর বলতে পঞ্চমুখ, বলেন—কত বড় বংশের এ ছেলে শুধু তাই নয়, কতবড় সত্যতার আমরা উত্তর পুরুষ এ-চিন্তায় ও যেন জন্ম থেকে শোধন হয়ে যাওয়া। এ তো সোজা কথা নয়!'

ঠিক, ঠিক—অতি ঠিক।' বন্ধুর গুণে মুগ্ধ গঙ্গাদাসও বলতে লাগল—'এই যে এতটা রাত হোল কিন্তু যেখানেই থাক, কোন কাজেই যে আছে এ তো কেউ না ভেবে পারিনে।'

মমতা ব্যস্ত হয়ে রবিকে বলল—'আপনাকে কি আর কিছু দেব ?'

'দেবেন! তবে দই একটু দিন।'

'দেখো হে'—গঙ্গাদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল—'অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে, বোঝাই ভারী ক'রো না।'

গৃহে রওনা হলে গঙ্গাদাস বলল—'নাঃ, শুধু নিজেই পালিয়েছে! নয়তো বন্ধুর আমার রঙ-জ্ঞান নয় রস-জ্ঞানও আছে—কাল দেখা হলে ধন্যবাদ দিতে হবে।'

কথা হয়েছিল উর্মিলাকে সে-ই পৌঁছে দেবে, এবং সনাতন আলো ধরে জঙ্গলপথের সঙ্গী হলেও মমতাও অতিথিদের এগিয়ে দিতে পিছন পিছন যাচ্ছিল। উর্মিলা বলল—'আপনার বন্ধু তো পলাতক—ফেরারী। আর আমার বন্ধু যে তাঁর অপরাধের সমস্ত ভার কাঁধে নিয়ে এত করল, তার ভাগে ধন্যবাদের বেলায় বুঝি চন্দ্রবিন্দু? পণ্ডিতের বিচার কিনা!'

গঙ্গাদাস হেসে উঠল—'না না, ওঁর পাওনার যে সীমা-সংখ্যা নেই, অদেয়। তাছাড়া কাল একবার দেখা হয়ে নিক—ওঁর কাছে ত্রুটি মানবে—মানাব, তবে থালা পাবে। হয়েছে কি।'

'আমি বলি—তার কি কিছু প্রয়োজন আছে?' পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে মমতা বলল।

গঙ্গাদাস কথার মাঝেই বলে উঠল—'প্রয়োজন! আছে না? একশো বার আছে। কাল একবার দেখা হতে দিন।'

মমতা আর কথা বলল না। কিন্তু উর্মিলা জনান্তিকে হেসে বলল—'তোমার মুখে যে চাঁদ ও মেঘের খেলা চলছে ভাই!'

'ওঁদের সামনে বসে খাওয়া—তোর কিন্তু পেট ভরল না।'

'তাই?'

'তাছাড়া কি।'

সে জবাব এড়াতে চায় বুঝে উর্মিলা হাসল, বলল—'তা হোক।

মন ভরে আছে। আচ্ছা, ফিরে এসে কতটা অনুতাপ করলে তবে রেহাই দিবি?' একটু থেমে বলল—'সেই জন্যেই নিয়ে গেলাম না। না হলে কি ভেবেছিস এই জঙ্গলে তোকে রেখে যেতাম! আগে আসুন, কেন গেলেন সেকথার গল্পে—

'ঊর্মিলা!'

মমতার কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয়েছিল। গঙ্গাদাস চমকে বলল—'কি? কি হোল? রবি দাঁড়াও—সনাতন আলো ধর—দেখ, দেখ কি হোল।' চলতে চলতে ওরা তিন জনে এগিয়ে পড়েছিল।

ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে পড়ে কৃত্রিম ভীতকণ্ঠে বলল—'নিশ্চয় বাঘ কিংবা ভালুকের বাচ্চা! পথের এপাশ থেকে দৌড়ে ওপাশে চলে গেল।' বলে সে আঁধারে বারংবার আঁচলটা মুখে চাপতে লাগল।

সনাতনের মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। সে আবার চলতে আরম্ভ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—'না। ওরা গোটাকত শজারু—কদিন থেকে বাগানে দেখছি।'

গঙ্গাদাস চকিত হয়ে বলল—'সে-ও তো বিপজ্জনক প্রাণী। কোন ধারটাতে থাকে?'

'থাকেই কোথাও! বাসা তো দেখিনি।' সনাতন চলতে চলতে রুদ্ধকণ্ঠে বলল—'এ জঙ্গলে থাকে না কি! কেবল মানুষ চলে গেল—কি সব মানুষই তাঁরা ছিলেন!' সে যেন স্মৃতির বেদনা-ভারে চুপ করে গেল—সন্ধ্যা থেকেই বৃদ্ধ একপ্রকার চুপ করে আছে।

সড়ক রাস্তায় তারার মন্দ আলো। ওঁদের পৌঁছে দিয়ে মমতা সনাতন ঘরে ফিরে এল।

কিন্তু একটু পরেই মমতা যখন বলল—'সনাতন, তোমাকে যে কষ্ট করে আর একবার আলো ধরতে হবে—গাড়ির পথ পর্যন্ত শুধু।' তখন

সনাতন অতি-মাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল। বলল—'তবে তুমিও কেন ওদের সঙ্গে খেয়ে নিলে না?'

'এই ঘরে সব গোছান রইল—এলে দেখিয়ে দিও।'

'কিন্তু তুমি যে কিছুই খেলে না!'

'শরীরও ভাল নেই। চলো।'

সনাতন ক্ষুব্ধভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল, বলল—'চলো।'

হলঘরের জানলা-দরজা দিয়ে আলোর বন্যা ধেয়ে বেরিয়ে লালকুঠির সুমুখের উদ্যান, সুরকির পথ, সব আলোময় করে তুলেছে। অন্যান্য অতিথিরা চলে গিয়েছেন। কৃষ্ণা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ভাস্করকে বিদায় দিতে দিতে স্মরণ করিয়ে দিল—'নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলেন। কাল আসছেন—মনে থাকে যেন!'

এসবার সময়কার সেই সংকুচিত কুণ্ঠা আর ভাস্করের ছিল না। তবু উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল, বলল—'কিন্তু—'

কৃষ্ণা কৃত্রিম বিস্ময়ে বলল—'বারে! এরই মধ্যে উল্টো সুর [illegible] হবে না। তাছাড়া আজ বাস্তব জীবন থেকে মূর্তি গড়বার আলোচনাও তো শেষ হোল না?'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' বলে ভাস্কর হেসে এগিয়ে চলল। সে লক্ষ্য করেছিল—কৃষ্ণা যখন হাসে কিংবা অমনি করে তাকায় তার দু'গালে দু'টি টোল পড়ে যা অনুপম, অথচ তখন তার মুখের দিকে তাকানও চলে না।

কৃষ্ণা বলল—'পাচু!'

'হাঁ দিদিসাহেব, ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি।'

গাড়ি ভাস্করকে তুলে নিয়ে চলে গেলেও কৃষ্ণা অদ্ভুত হাস্যে মুখ ভা
কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডাকল—'পাঁচু!' মা
মনে যেন মতলব চলেছে।

'হ্যাঁ, দিদিসাহেব!'

'বাবা আসেন নি?'

'গাড়ি ওখান থেকে তবে ক্লাবে যাবে।' পাঁচু জবাব দিল।

'আর মিস্ পাউয়েল্?'

'তাঁর শরীর ভাল নেই। শুয়ে পড়েছেন।'

ভাস্কর বেশ সহজ কিঞ্চিৎ লঘু মনেই গৃহে ফিরছিল। এ-আশংক
মনে মনে চোখ রাঙায়নি তা নয় যে, সব অঘটন সনাতন কিং
লোচন মারফত মমতার কানে যাবে। অথচ মমতাকে সে কথা দিয়েছি
—আসবে না। স্থির করল কাল দেখা হলে আগে সে-সব কথা ব
অপরাধ লঘু করে আনবে। মনটা সহজ হয়ে গেল।

গৃহে পৌছলে সিঁড়ি পেরিয়ে সনাতনের সঙ্গে দেখা। সে মোটরে
আওয়াজ শুনে বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। ভাস্কর বলল—'এ
যে! তোরা খেয়ে নে গিয়ে—খাব না আমি।'

সনাতন তবু নড়ে না দেখে ভাস্কর বুঝল—খাওয়া বাদ দিলে বুঢ
দুঃখ হয়। তাই প্রবোধ দেবার স্বরে বলল—'খেয়ে এসেছি। আ
যে-বান্নাই তোরা করিস—তোদের ধরে ধরে মেডেল দেওয়া উচিত
বলে ঘরে চলে গেল।

পিছন পিছন সনাতনও এসে দাঁড়ালে, ভাস্কর বলল—'আবার বি
বললাম যে!'

'আজ্ঞে, দিদিমণি খাবার রেখে গেছেন।'

ভাস্করের ভ্রূ কুঞ্চিত হোল, জিজ্ঞাসা করল—'তিনি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আশ্রমের আরও অনেকে এসেছিলেন।'

ভাস্কর বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল—'কেন?'

সনাতন বলল—'কালকের সেই শিকল-ভাঙা নিয়ে তোমার জন্যে সন্ধ্যায় ওঁরা ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন।'

ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে গেল। সারা-দিনের অনেক কথা—মমতার গঙ্গাদাসের অনেক আচরণ মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হোল না।

৮

পরের দিন সকাল হতে মমতা স্টুডিয়োতে যাবে কি যাবে না, এই দো-মনা ভাব প্রবল অভিমানের মধ্যে শেষবারের মতো নিষ্পত্তি করে যখন স্থির করল—সে যাবে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। কয়েক দিনের অনিয়মে শরীর ভাল নয়, ফিরে এসে সময়-মতো আশ্রমে পৌঁছতে বেগ পেতে হবে তবু সে যাবার ইচ্ছা ছাড়তে পারল না। গত সন্ধ্যার জন্য কৌতূহল তো ছিলই, তাছাড়া ঐ স্টুডিয়ো তাঁদের যুগ্ম-মনের সৃষ্টি। মামা অনেক দিন নিবারণ করতে চেয়েও তার নিঃশব্দ ইচ্ছার সঙ্গে পেরে ওঠেননি। আজ অভিমান তাকে পিছন টানলেও অভ্যাস তাকে টেনে নিয়ে গেল।

সনাতন ভারী ক'খানা সাবেকী বাসন ঘষে-মেজে কাঠের সিন্দুকে তুলে রাখছিল, মমতাকে আসতে দেখে হাসল একটু—'কালকের বাসনগুলো।' তারপর সে মনে পড়ায় এগিয়ে এসে গামছার খুঁট থেকে একখানা চিঠি নিয়ে পড়তে দিল। বলল—'কিছু আগে দিয়ে গেছে।'

মমতার মুখ শুকিয়ে গেল—'কালকে আসেননি?'

'হ্যাঁ, অনেক রাতে। সাদা একখানা মোটর এসে দিয়ে গেল। এসে খেলেন না।' কিন্তু সনাতন বিস্মিত হোল দেখে যে, মমতা যেন আশানুরূপ চমকে গেল না। মুখটা কিছু গম্ভীর হোল মাত্র।

'কাল সন্ধ্যার কথা শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

মমতা তবু একটু অপেক্ষা করে বিমনা হয়ে চিঠির ভাঁজ খুলতে লাগল। সনাতন আস্তে আস্তে আবার কাজে লেগে গেল, বলল—'আর কি এ-সব পারি, বুড়ো হয়ে গেছি! কিন্তু গিন্নী-মা যখন এগুলো কিনতেন আর বলতেন—সনাতন, এটাতে বৌমা এসে মাংস রাঁধবেন, এটায় পায়েস ঢালবেন এগুলিতে নাতিরা খাবে—সে-যে শুধু সনাতনই জানে! তাই গুছিয়ে তুলে রাখি আর দিন গুনি। এখন বৌমা এ-সব দেখে বুঝে নিন, আমি বাঁচি।'

কিন্তু বলে মমতার মুখের দিকে লক্ষ্য পড়ায় সনাতন সহসা কুণ্ঠিত হয়ে 'না, না' করে আপত্তি করতে লাগল।

মমতা চিঠি পড়েই স্তব্ধ হয়ে ছিল, সনাতন বলতে লাগল—'আমি তো কাউকে মনে করে বলিনি! আমি তো কোন দোষ ভেবে বলিনি খুকি!'

মমতা কথা বলল না। কিছুক্ষণ কেটে গেলে জিজ্ঞাসা করল—'বললে এসেছেন, কিন্তু স্টুডিয়ো বন্ধ যে?'

সনাতন যেন অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পেল, বলল—'এখনও ঘুমোচ্ছেন কি-না!'

'ঘুমোচ্ছেন!'

সনাতন মাথা নাড়ল—'হ্যাঁ, ক'বার গেছি—তাই তো দেখে এলাম।'

মমতা যথার্থ-ই বিস্মিত হয়ে গেল। সূর্য ওঠার পরে কোন দিন ভাস্করকে কেউ বিছানায় দেখেনি। কিন্তু দুর্নিবার কৌতূহল সত্ত্বেও

তখনই ভাস্করের ঘরে যেতে পারল না। কিছুক্ষণ গেল কর্তব্য ভাবতে কিছু সময় সনাতনের সঙ্গে নানা কাজে ব্যয় করেও যখন দেখল বেলা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে তখন আর বিলম্ব করতে না পেরে ভাস্করের ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল। ঘুমন্ত অন্যের ঘরে এমন ভাবে প্রবেশ করায় গোপন লজ্জাও ছিল। কিন্তু প্রবেশ করে যা দেখল তাতে বিমূঢ় হয়ে গেল। ভাস্কর ঘুমোচ্ছে বটে কিন্তু বিছানায় নয়—চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে আছে। সমস্ত রাত যে বিছানায় পিঠের সংস্পর্শ ঘটেনি তা নির্ভাজ বিছানা দেখলেই বোঝা যায়। চোখ-মুখে রাত-জাগার ক্লান্তি, চুলগুলো এলোমেলো, হাত-দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে আছে চেয়ারের হাতলের পরে।

মমতার মনের মধ্যে নিমেষের জন্য একটা অশান্তি দেখা দিয়ে হায়-হায় করে উঠল যার স্বাদ পূর্বে কখন পায়নি।

অগভীর ঘুমে কেউ নিকটে এসে দাঁড়ালে তার উপস্থিতি অস্পষ্ট করেও একরকম অনুভব করা যায়। তাই ভাস্কর তদবস্থ থেকে বলল—'লোচন? লোচন জল দে।'

মমতা নিঃশব্দ পায়ে জল নিয়ে ফিরে দেখল, ভাস্কর তখনও তেমন ভাবে পড়ে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল—'জল।'

ভাস্কর গলার স্বরে আরক্ত চোখ মেলে চমকে সোজা হয়ে বসল তন্দ্রাঘোরেও যার ক্ষুব্ধ মূর্তি এতক্ষণ যেন দুঃস্বপ্ন দেখছিল, তন্দ্রাভঙ্গে তারই জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শুধু আকস্মিক নয়। মুখ নামিয়ে ডাকতে লাগল—'লোচন! লোচন!'

'লোচন বাজারে গেছে।'

'সনাতন! সে-বেটা কোথায় গেল, সনাতন!' ভাস্কর তবু মুখ তুলে একটা অন্তরাল বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

মমতা ম্লান হাসল, বলল—'হয়তো কোন কাজে গিয়ে থাকে কিন্তু জল তো আমি এই প্রথম দিচ্ছিনে।'

এ-কথায় ভাস্কর গেলাস টেনে নিয়ে তার শেষ জল-বিন্দু অ নিঃশেষ করে আবার ফেরত দিল। কিন্তু তারপর কথা কোথা থে সুরু করবে ভেবে পেল না। এর পর আর কালকের জন্য ত্র স্বীকার করা কিংবা আজকের এই বিলম্বে ওঠার অজুহাত দেখ নিতান্তই ছেলেমানুষি হবে।

গেলাস নিতে নিতে মমতা বলল—'আর আনি?'

'না। উঃ, কি বেলা হয়ে গেছে।' ভাস্কর যেন অতিক্রান্ত ঘ মধ্যে তৃতীয় কাউকে শুনিয়ে গেল—'আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা নয় আশ্রম আছে, মূর্তির কাঠামোতেও আজ হাত দেওয়া চাই—এমনি কাল সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়ে গেল।'

মমতা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, বলল—'তাই বা কি করে হবে আজ সন্ধ্যাতেও নেমন্তন্ন আছে—সেখানেই।'

ভাস্কর কথার ঝোঁকে উড়িয়ে দিতে চাইল—'কোন নেমন্তন্ন নেই আমি যাব না।'

'তা কি হয়!' মমতা একটু নীরব থেকে বলল—'আপনি কথা দি এসেছেন, তাঁরাও জোগাড় করে অপেক্ষা করে থাকবেন।' বলে এগি এসে চিঠিখানা টেবিলের পরে রাখল।

ভাস্কর চমকে মুখ তুললে মমতা ঘাড় নেড়ে বলল—'সকালে দি গেছে। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।' সে গেলাস নিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো বসে রই বোঝা ক্রমেই ভারী হচ্ছে। হঠাৎ উঠে গিয়ে সনাতনকে ডাকল 'জালাতন! জালাতন!'

'দাদাবাবু।'

'উনি কি চলে গেলেন?'

'হ্যাঁ, গেছেন। কিন্তু ডাকব?'

'ডাকবি! আচ্ছা, এখন না হয় থাক।'

ভাস্কর ফিরে এসে চিঠিখানা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল।

মমতা একটা বিষণ্ণ মন নিয়ে গৃহে ফিরছিল, শরীরও মন্থর। বাইরের ঘরে পৌঁছলে ভুবনবাবু সোল্লাসে বলে উঠলেন—'এই যে, মমতা এসে গেছে!' এবং উদয় ফিরে তাকিয়ে দু'হাত যুক্ত করে বলল—'নমস্কার!'

অজানিতে মমতার মুখের উপর কালো একটা দাগ পড়ে গেল, উদয়ের পৌঁছা-সংবাদ তার জানা ছিল না। বলল—'নমস্কার। এখন আছেন তো কিছুদিন?'

'কিছুদিন!' উদয় হাসল—'আশা করি নির্বাচনের সংবাদ শুনেছেন?'

মমতা ঘাড় নাড়ল।

উদয় বলল—'কিছুদিন কেন, এখন আর অনেকদিনই আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে থাকতে হবে না। ভাগ্য আমার দিকে, জিতিয়ে দিচ্ছেন তিনি।' বলে হাসতে লাগল।

মমতা বলল—'তাহলে দেখা হবে। আমার আবার আশ্রমের তাড়া।' বলে ভিতরে চলে গেল।

উদয় মুখ কালো করে বসে পড়ল। ভুবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—'উনি এখন এলেন কোথা থেকে?'

নিরুত্তর ভুবনবাবু তার মুখের প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। শেষে যেন সদ্য-সদ্যই শুনতে পেলেন এমন ভাবে চমকে বললেন—'কে—মমতা? এই শোন—হেঁ-হে-হে। তোমরা হলে আজকালকার

ছেলে-মেয়ে, কে যে কোথায় যাও কখন ফের—সে-কি আমরা বলতে পারি !' তিনি হাসতে লাগলেন।

উদয় হাসল না। সোজা জিজ্ঞাসা করল—'ভাস্করবাবুর স্টুডিয়ো কেমন চলছে আজকাল ?'

অগত্যা ভুবনবাবু হাসি থামালেন—'কোথায় পাব সংবাদ, বারোমাস বিছানায় পড়ে থাকি। বোধ হয় মন্দ নয়।'

'শুনে সুখী হলাম। অনেকদিন শহর ছাড়া কিনা! শুনেছিলাম ভাস্করবাবুর বাড়ি বাঁধা যমুনাপ্রসাদের কাছে—তা, সেসব তো চুকে-বুকে গেছে ?'

ভুবনবাবু অনাসক্ত ভাবে বললেন—'জানিনে। আর যমুনাপ্রসাদ তো তোমাদেরই কাউন্সিলর—একবার না হয় খোঁজ নিয়েই দেখনা। যদি কিছু—,'তিনি ভাবনার মধ্যে ডুবে যাওয়ায় কথাটা যেন শেষ করলেন না।

উদয় টেবিলের কলমদানি থেকে কলম নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল, বলল—'হুঁ। এবার ভোটের ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্যও করেছিলেন। এতদিন দেখা করিনি—ত্রুটি হয়ে গেছে বটে !'

সহসা ভুবনবাবু ভাবনার সমুদ্রে কূল পেয়ে যেন তীরে উঠলেন। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'কিন্তু তুমি যা ভাবছ উদয়, তা নয়।'

উদয়ের কলম নাড়া থামল।

ভুবনবাবু মুখখানা হাসার মতো করে বললেন—'আশ্রমের তাড়া ছিল বলেই মমতা চলে গেল, পৌঁছতে দেরি হলে ওর সইত না। তবু বলতে হবে বৈকি, ওর আরও কিছুক্ষণ বসা উচিত ছিল—তোমার খোঁজ-খবরও নেওয়া উচিত ছিল। না হয়, আশ্রমে যেতে হোত একটু দেরি—তা বলে অমন করে চলে যাওয়া ওর সমীচীন হয়নি।'

'কিন্তু আপনার যেমন ইচ্ছে উনি হয়তো আশ্রমকে তেমন ভাবেন না—হয়তো আশ্রমে অন্য স্বার্থও আছে।'

ভুবনবাবু উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন এবং হাসতেই লাগলেন। বললেন—'তা যা বলেছ। আশ্রম! সুস্থ নর-নারী গড়ে তোলবার কারখানা! এঁ্যা! তা কত জায়গাতে তো বায়ু-বদল করে দেখলে—একবার দেখই না ওখানে এক-ক্ষেপ ফেলে। লেগে যেতেও পারে। কি বলো? ও-তো আবার তোমাদেরই সীমানার মধ্যে—মানে, মুনিসিপ্যালিটির?' বলে রহস্যভরে হাসতে লাগলেন।

উদয় নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল—না, কিন্তু তার চোখের কোণদুটো একবার যেন চিকচিক করে গেল।

ভুবনবাবু সেটা দেখেও দেখলেন না। তেমনই হেসে বললেন—'না বুঝি? নাই বা হোল। আমি বলি, যতীবন্ধুই তো আশ্রম—চাঁদা চেয়ে দান নিয়ে নানা সংকটে ভাঙা তরী ভাসিয়ে রেখেছে সেই—হেঁ-হেঁ-হেঁ! লোকটি চতুর আছে, উদয়, সব রকমই বোঝে। তোমার দ্বারা তার যে কোন উপকার হবে না এমন তো কথা নেই!'

কিন্তু উদয় সে ইঙ্গিতের নিহিতার্থ ঘুণাক্ষরেও বুঝল বলে দেখাল না। নিতান্ত অন্যমনস্কের মতো কলমটাকে টেবিলের উপর বারকতো ঠোকা মেরে ঘাড় নেড়ে বলল—'উপকার! কিন্তু কি-ই বা আমি করতে পারি—গুণীও নয়, শিল্পীও নই! অতি ক্ষুদ্রই আমার সাধ্য—দেখা যাক!'

ভুবনবাবু হাসতে লাগলেন—'হেঁ-হেঁ-হেঁ। একি, এরই মধ্যে উঠবে নাকি?'

'তাবলে আপনার স্নেহ ফেলেও যাচ্ছিনে!' উদয় দাঁড়িয়ে বলল—'সে-ই আমার আশা—আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। কাল আসব।' বলে চলে গেল।

অনতিপরে এ-ঘর দিয়ে আশ্রমে যাবার পথে মমতা যখন দেখবে যে, উদয় তখনও বসে—তখন তার ব্যস্ততার ভান করে যেতে যেতে সে-ই এক পলক নিরাসক্ত দৃষ্টি উদয় মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে আর বিলম্ব করার উৎসাহ পেল না।

৯

সেদিন উদয় হয়তো ঠিকই বুঝেছিল, কিন্তু যেমন ভাবা যায় সর্বত্র তেমন ঘটে না।

মমতা বাইরের ঘর থেকে ভিতরে এলে তার মুখের দিকে চেয়ে বসুমতীর হাতা-নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। ডাকলেন—'এদিকে আয় তো!'

'কেন—থাক।' মমতা পাশ কাটাতে গেল।

'মুখ যে কালি হয়ে গেছে।' বলে বসুমতী নিজেই উঠে এলেন। তার চিবুক-কপাল পরখ করে বললেন—'যা ভেবেছি, গা যে পুড়ছে।'

মমতা মনে মনে শংকিত হয়ে উঠল। সকালে ভাস্করের সঙ্গে কোন কথাই হতে পারেনি। তাছাড়া কিছুক্ষণ পরে আশ্রমে তাঁর সঙ্গে গঙ্গাদাসদের দেখাও হবে। বলল—'আজ যে একবার যেতেই হবে, মা!'

মা সংক্ষেপে বললেন—'শুয়ে পড়ো গিয়ে।' তারপর গিয়ে ভাবিত মুখে হাতা নেড়ে রাঁধতে লাগলেন।

মমতা ভয়ে ভয়ে বলল—'এ সামান্য একটু গা-গরম।'

কিন্তু বসুমতী আর কথা বললেন না।

মায়ের সেই শান্ত রূপ মেয়ে চিনত, অতএব নিরস্ত হয়েছিল। এবং তখনই না হলেও শুতেও যখন হোল, ক'দিন ভোগান্ত না হয়ে যায়নি। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ব্যাধি-যন্ত্রণার উপরও তাকে এই ভাবনা এক

মুহূর্তের জন্য ছাড়তে চাইল না যে, আজও সেখানে যাওয়া হোল না— অথচ সেদিন তিনি সুস্থ ছিলেন না, হয়তো অসুস্থ শরীরেই কাজ করে চলেছেন। কিন্তু মমতা কি জানে না, সেই নির্বিকার লোকটির চারপাশে কি-পরিমান জঞ্জাল আর বিশৃঙ্খলা এই ক'দিনে জড়ো হয়ে উঠেছে? স্টুডিয়ো পরিষ্কারের কাজও অনেকদিন থেকে সে নিজের হাতে করত, আজ সনাতন কিংবা লোচনের পর মনে মনে ছেড়ে দিয়ে কোন প্রকারেই স্বস্তি পেল না।

সেদিনের রহস্যপূর্ণ নিমন্ত্রণ, কৃষ্ণা গুপ্তা কে, কেন ভাস্কর 'যাব না' বলেও গিয়েছিল, তার পরের সংবাদ বা কি—এমন শত কৌতূহল নিরন্তর যে বেড়ে চলেনি তা নয়। কিন্তু সে কোন অবস্থাতেই সেগুলিকে স্পষ্ট হতে দিল না। তিনি হয়তো দেখা হলে নিজেই বলবেন। তাছাড়া ত্রুটি তারও তো বড় কম হয়নি—ভোজের কথা সে-ই জানায়নি আগে এবং পরের দিনে ভাস্কর হয় তো বলতেই চেয়েছিল, কিন্তু সে অভিমানে পড়ে বলবার অবসর দিল কোথায়?

ক'দিন ভুগে এবং বসুমতীর আদেশে আরও ক'দিন ঘরে আটকা থেকে মমতা এই প্রশ্নগুলি ভাবতে ভাবতে স্টুডিয়োতে আসছিল। নিজেরও তার অনেক কথা জমা হয়ে ছিল। উদয় পৌঁছেচে শুধু তাই নয়, সে রোগশয্যায় প্রতিদিন এসে খবর নিয়ে যেত। অথচ ভাস্কর তো একদিনও খবর নেবার প্রয়োজন ভাবল না। কথাগুলো শুনতে শুনতে ভাস্করের যে চাপা-হাসি তা যেন দেখতে পেয়ে মমতাও হাসল একটু।

সেকালের সারবন্দী সোপানশ্রেণী ভেঙে মমতার আজ বারান্দায় উঠতে শ্রান্তি লাগছিল। সনাতন দেখতে পেয়ে ছুটে এল—'আজ যাব ভেবেছিলাম। এতদিন আসোনি যে?'

'বিছানায় পড়ে ছিলাম। তোমাদের সংবাদ তো ভাল?'

সনাতনের মুখ গম্ভীর হোল—'ভাল বৈকি! তবে—'

মমতা মৃদু অনুযোগ করে হাসল—'তুমি বড়ো খুঁতখুঁতে, সনাতন। কিছুতেই মন ওঠে না তোমার!'

'নাঃ, ওঠাউঠি আর কি। তবে কিনা দাদাবাবুর সেই সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ লেগেই আছে, আর সেই সাদা মোটরখানার নিয়ে যাওয়া পৌঁছে দেবারও বিরাম নেই—এই যা। এক এক দিন রাতও দুপুর গড়িয়ে যায়।'

মমতার মুখ পলকের মধ্যে শুকনো হয়ে গেল, ডাকল—'সনাতন?'

সনাতন গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল—'হ্যাঁ খুকি। বুড়ো হয়ে গেছি, নানারকমের দুশ্চিন্তা তো না করে পারি নে!'

মমতা আর অনুযোগ করল না। কিন্তু সে এর পর যখন স্টুডিয়োতে পৌঁছে কর্মরত ভাস্করের অদূরে একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বসে পড়ল, তখন তার সেই বসার মধ্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের একটা বোঝা এমনই প্রকাশ হোল যে, ভাস্কর নিমিষের জন্য কাজ ছেড়ে তার মুখের দিকে না চেয়ে পারল না। তবু ভাস্করের তখনই মনে হোল মমতা প্রথম নিমন্ত্রণের পরদিন থেকে আর আসেনি। কেন আসেনি সে মনে মনে একটা অনুমানও করে রেখেছিল। এখন মমতার শুকনো চোখ-মুখ বিষণ্ণ শিথিল ভঙ্গি ভাস্করকে নিঃসন্দেহ করে আনল। দু'জনের কেউই প্রথমে কথা বলল না।

কিন্তু নিঃশব্দে বেশীক্ষণ বসে থাকাটা কাউকেই স্বস্তি দিল না। ভাস্কর একটা সম্পূর্ণপ্রায় মূর্তির পরে আঙুলের আরও গোটাকত চাপ দিয়ে বলল—'শরীর তেমন ভাল দেখছি নে যেন।'

'না, তেমন কিছু নয়।' মমতা অল্প নড়ে বসল।

'ওঃ।' বলে ভাস্কর কাঠিটা তুলে নিল। মনে মনে বলল—আসার বাধা যে শরীর হয়নি সে আমিও জানি। কিন্তু মুখে সে কিছু প্রকাশ করল না।

এই ক'দিন কোন কাজই বিশেষ এগোয়নি। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কাজ চালাবার পর ভাস্কর সুমুখের মূর্তিটাকে দেখিয়ে দিয়ে ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গিতে বলল—'শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে।'

মমতা ম্লান চোখে তাকিয়ে রইল, আজ তো এ সংবাদ সে শুনতে আসেনি!

ভাস্কর কথাটা তাড়াতাড়ি শুধরে বলল—'না—মানে হয়ে গেলেই তো পকেটে কিছু আসে, কিছু পাই। লোচন-সনাতন-ভাস্কর বোঝাই এই সংসারতরীর ওজন যে কত তা কি বুঝিনে মনে করো?'

'আমি তো চাইনি।'

'কিন্তু আমি যে দেখছি। আর জান তো এ-দুটো চোখ!' বলে সে নিজের রসিকতায় হাসতে গিয়ে মুখ আরও কালো করে তুলল।

মমতা ভেবেছিল উদয়ের কথা তুলবে। কিন্তু সে সংকল্প পরিত্যাগ করল। একটু থেমে বলল—'কিন্তু সে-দুটো চোখে কি আর কিছুই ধরা পড়ছে না?'

ভাস্কর কাজ থামিয়ে তাকাল।

মমতা বলল—'হ্যাঁ, সেদুটো চোখ কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সব তাতেই অন্ধ?' সে কথাটা আরও স্পষ্ট করবার ভাষা না পেয়ে চুপ করে গেল।

'মমতা!'

ভাস্কর হাতের কাঠি কাদায় চেপে কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল—'একথা কেন?'

মমতা চোখ নামিয়ে নিল।

ভাস্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'মাসের শেষ—আবার একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে নিশ্চয়, না? যমুনাপ্রসাদের টাকাটা কি তবে এ-মাসে গেল না?'

'গেছে।'

'তবে!' ভাস্কর হাল্কা হয়ে বলল—'ও বুঝেছি। ওদের কারও াইনেয় কম হোল।' তারপর বলল—'জানতামও, কম হবেই তো! আমার কোন অসুবিধেই ছিল না, লোচনকে মিছেমিছি রাখতে গেলেম।'

'আপনি কেন ভাবছেন যে খরচের তাগাদা দিচ্ছি। ওতে দুঃখ াই জানেন!' বলে মমতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সুগোপনে চাপতে লাগল কিন্তু যে-প্রশ্নের ভিড় বুকের মধ্যে জ্বালা করছিল তাদের একটাকেও খে ফুটে বলতে পারল না।

সে না বললেও ভাস্কর এবার অনুমান করল। কিন্তু তার পক্ষেও হজ আর সহজ ছিল না। এসে মূর্তির কাজে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে লতে লাগল—'প্রত্যেকটি মাসের শেষে উদর নিয়ে এই জৈবন্তরের চিন্তা যেন বিভীষিকা। ক্লান্ত হয়ে গেছি, কত সময়ই নষ্ট হয়ে যায়! র শেষ না হলে মনের যেন শেষ হয়ে যাবে। অথচ এ ধূমকেতু উঠবেই—ঋণ থাকতে ফাঁকি দেওয়াও চলবে না।'

কথাগুলো ছাড়া-ছাড়া, কিছু যেন অসংলগ্ন। মমতা তাকিয়ে রইল।

ভাস্কর ইতস্তত করে আবার বলতে লাগল—'তাই ভাবছি···মাস্টার-শায়ের মূর্তি আমি গড়ব—তিনি তার জন্যে যে-মূল্যই দিন, সে অমূল্য। স থাকবে আমার সাধনা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু-কিছু বিলাস-তিতেও হাত না হয় দিলাম? এ-যুগ তো তার দাম দিতে চায়।'

'সে কি আপনার আদর্শের বিরুদ্ধে যাবে না?'

'কেমন করে?'

'এই যুগকেই কি ফাঁকি দেওয়া হবে না?'

ভাস্কর একটু থেমে বলল—'শিল্পীর যে-অংশটুকু যুগের নয় দেশের

নয়—যার কেবল খেয়ালবশে সৃষ্টি করে আনন্দ তার ওপর কি কোন দিনই সদয় হবে না?'

মমতা সে-কথার জবাব দিল না, বলল—'তাছাড়া—'

'বলো।'

'তাছাড়া শুনেছি তার জন্যে যে-মডেল দরকার এদেশে তার আশা করাও দুরাশা।'

'দুরাশাই তো ছিল।' ভাস্কর বলল—'কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হলে দুরাশাও তো কখনও কখনও সফল হয়ে যায়! এখন বড় দরকার কিছু সময়—তাঁর মনকে প্রস্তুত হতে দেবার। তারপর রাজী তিনি হবেন, আমি বলছি এ না হয়ে কখনও যায় না!' কিন্তু অকস্মাৎ সে সন্দিগ্ধদৃষ্টি মেলে চেয়ে থেকে ভিন্নস্বরে বলে উঠল—'সত্যি বলোতো, এই জন্যেই কি এতক্ষণ তুমি আপত্তি করছিলে? কিছুতেই আর স্বীকার করছিলে না।'

মমতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একাগ্র হয়ে শুনছিল, সহসা এই রূঢ়প্রশ্নে চমকে উঠে মুখ নামিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর সেই আসনেই বসে থাকল, বুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মমতা ঐ নিঃশব্দে উঠে যাবার ভিতর দিয়ে একটা কথা নিশ্চিত করে দিয়ে গেল যে—'মত নেই, দিতে পারব না'। ভাস্কর লালকুঠির রূপচ্ছটা কল্পনা করে একবার ঘরের দিকেও তাকিয়ে দেখল। প্রায়ান্ধকার ঘর, পুরানো বিবর্ণ দেয়াল, পাংশু আসবাবপত্র সবাই যেন একমুখে বলছে —আমাদের দিকে চাও। বাস্তুপুরুষ যে সঞ্জীবিত হয়ে তোমার দিকে চেয়ে আছেন, তোমার কি অন্যদিকে মন দেওয়া সাজে?

ভাস্কর কোন দিক থেকেই মমতার অনুমিত মতটাকে ডিঙোবার উৎসাহ পেল না।

সে কি পারবে না তা যখন স্থির হয়ে গেল তখন, যা করতে হবে

তার জন্য প্রস্তুত হোল। কৃষ্ণা গুপ্তার সঙ্গে অনেক আলোচনার পর স্থির হয়েছিল—জীবনের হুবহু করে মূর্তি গড়বে, তাকে বলে আসবে সে-ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হোল।

কিছুদিন থেকে দেরিতে উঠছিল বলে তার আশ্রমে যাওয়ায় বিলম্ব হচ্ছিল। সে আজকের জন্য যাবার সংকল্প একেবারে ছেড়ে দিল। ভেবে দেখল শেষ-বেশ আজকের দিনটাতো! বেলা পড়ে এলে একসময় অন্যমনস্কের মতো লালকুঠির সুমুখে এসে উপস্থিত হোল।

নোবীন বেরিয়ে আসছিল। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—'এই আসা হচ্ছে বুঝি?'

ভাস্কর উত্তর দিল—'হুঁ।'

নোবীন মুখ কালো করে হাসতে চাইল—'স্বাগতম। অভিনন্দন জানাই।'

'হঠাৎ!' বলে ভাস্কর চকিত হয়ে ফিরে তাকাল। কিন্তু দেখতে পেল নোবীন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

মহারাজ নোবীনকে গেট খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভাস্করকে খাতির করে আহ্বান জানাল—'আইয়ে!'

'এ্যাঁ, আসব?' বলে পথের দিক থেকে বিস্মিত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাস্কর অগ্রসর হয়ে এল।

মহারাজের প্রথম দিনের ত্রুটির জন্য কিছু কুণ্ঠা অদ্যাবধি ছিল। তাই ভাস্করের মনোভাব বুঝে আপ্যায়নের সুরে বলে—'বাবুসাব, ওর দিমাগ খারাপ আছে।'

'ভাল নেই—নয়? কেন বলো তো?'

'একদিন ভাল ছিল বলে—যেদিন এসেছিলেন।'

ভাস্কর জিজ্ঞাসুমুখে তাকাতেই মহারাজ মুখ নামিয়ে সংক্ষেপে বলল —'হাঁ, বাবুসাব, ছয় বছর গেটকিপার আছি।'

ভাস্কর চোখ নামিয়ে নিল না। কারণ কথাটাও স্বচ্ছ হয়নি, তাছাড়া যাতায়াতের দরজার পাশে এই লোকটার চেহারা যেন ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। যেমন নিঃশব্দ তেমন স্বল্পভাষী। ঐ বেঁটে চেহারা শতপ্রশ্নেও যে আর মুখ খুলবে না—সে তার দিকে তাকালে বোঝা যায়। ভাস্কর থেমে থাকলেও প্রশ্নও করল না। নিজের ভাবনা নিয়ে অগ্র হয়ে এগিয়ে চলে গেল।

হলঘরের সুমুখে পৌছুতে পাঁচুও এসে সেলাম করল। ভাস্কর বলতে গেল—'তোমার দিদিসাহেবকে একবার যে—'

পাঁচু হেসে বলল—'তিনিই ওপরের জানলা থেকে দেখতে পেয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন—আসুন, বসবেন।'

ভাস্করকে হলে বসিয়ে, পাখা খুলে, পাঁচু বলল—'চায়ের কথা বলে দিয়ে আসি।' সে ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। পাঁচু আদব-দুরস্ত চাকর।

থুতনির ভার হাতের মুঠির পর ন্যস্ত করে রাখা, অকারণে চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ—ভাস্কর বিস্মৃতের মতো বসেছিল। এমন সময় একটুকরো হাসির শব্দে ফিরে দেখল কখন যেন কৃষ্ণা এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে চেপে চেপে হাসছে। জগতের যেকোন গুরুত্বকে সেই চপলহাসি যেন টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতে চায়। তার চোখের দৃষ্টি চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ। শাড়ির কিনারা সযত্নে তনুর প্রতিটি রেখাকে দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে, তার এলোচুলের বোঝা আসলে এলো নয়—ভাস্কর বিমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল।

মুগ্ধদৃষ্টির সামনে কৃষ্ণা অপ্রতিভ হয়ে গেল না। হাসির রাশ টেনে বলল—'কই, প্রশংসা করলেন না?'

'হ্যাঁ-তা-তা—'

'থাক হয়েছে।' কৃষ্ণা পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল—'অমনি সুরু করে দিলেন তো? এমন স্তাবক হয়ে উঠেছে এই এখনকার দিনগুলো!'

ভাস্কর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কৃষ্ণার এ-ধরনের মারাত্মক পরিহাসের যে উত্তর খুঁজে পায় না।

তার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা সকৌতুকে হাসল। তারপর আলোচনার প্রসঙ্গ বদলে বলল—'আমি জানতাম, আপনি আসছেন।'

ভাস্কর চকিত হয়ে একটু নড়ে বসল—'হ্যাঁ, শুনুন—এসেছি বটে কিন্তু একটা—' সহসা কৃষ্ণার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে জিজ্ঞাসা করল —'জানতেন! কিন্তু আমার তো আজ আসবার কথা ছিল না!'

'জানি। তবু জানতাম আসবেন।' বলে কৃষ্ণা গালে দুটি বিভ্রান্তিকর টোল ফেলে বাঁকা চোখে তাকাল—'আর আপনিই জানতেন সবচেয়ে বেশী যে আপনি আসছেন। বলুন সত্যি নয়?'

ভাস্কর উত্তর দিতে গিয়ে মনের সন্ধান পেয়ে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে সারাদিনের কথা কাজ ও বিশ্রামের আড়ালে যখন এখানে আসার প্রসঙ্গ নিজেরই কাছ থেকে নিজে গোপন করতে ব্যস্ত ছিল তখন এই লীলাময়ী যে তার মুখের উপর ঐ হাসি ফুটিয়ে এই গৃহকোণে নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল—তার আসা সম্বন্ধে একটুকু সন্দেহ মনে ছিল না— এ যেন আর গোপন থাকল না।

কৃষ্ণা হেসে বলল—'এখন দেখছেন, কি ভয়াবহ হাতগুনতে পারি। নাঃ, আপনার আর কোনআশাই নেই!'

ভাস্করও হাসতে চাইল, পারল না। বলল—'আচ্ছা, এবার শুনুন—'

কৃষ্ণা তাকে থামিয়ে বলল—'দ্বিতীয় কথা—এও আমি হাতগুনে

বলছি'—যিনি ক'দিন বলছেন মূর্তি গড়বার ভূমিকা-হিসেবে ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম 'আজ আনব', তিনি আজও সেগুলো আনেন নি!'

ভাস্কর কুণ্ঠিত হয়ে গেল।

কৃষ্ণা বলতে লাগল—'এবং তিনি এসে অবধি এই না আনার কারণ জানাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। 'এবার শুনুন' 'শুনুন এবার'—অর্থাৎ আজও স্মরণ নেই কিংবা মেজাজ ছিল না।' একটু থেমে বলল—'কিন্তু আঁকার মতো প্রমিস্ নেই মুখে এই সত্যি কথাটা ভদ্রলোক কিছুতেই আর বলতে পারছেন না দেখে আমিও প্রচুর আনন্দ—'

'না, না—সেকথা নয়, এ সেকথা নয়।' বলে ভাস্কর মাথা নেড়ে অপ্রতিভ ভাবে হেসে উঠল।

কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে বলল—'কথা তাই-ই। ঠিকই বলেছি, কেবল কিছু গহনা দিয়ে সাজিয়ে বললে মিলে যেত।'

ভাস্কর মুখ জোর করে গম্ভীর করে আনল। বলল—'নাঃ, অনুমান আপনার পাহাড়-পর্বত কোথাও আটকায় না—যাখুশী বলে গেলেন। কিন্তু সত্যি বলছি—আপনি কি ভাববেন জানিনে—কালিদাস কোন 'আদর্শ'দেখে লিখেছিলেন 'লতেব তন্বী' অজানা বটে, কিন্তু আপনাকে দেখে সে-রূপ মাটিতে গড়া যেত।'

'বলেন কি, একেবারে কাব্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে?'

কিন্তু ভাস্কর পরিহাসে যোগ দিল না। পরন্তু সে জোর দিয়ে বলে উঠল—'আজ আঁকিয়ে হলে বুঝতেন আপনাকে দেখে লোভ সামলান কতো দুষ্কর।'

'বাঃরে, আমি কি লোভের বস্তু?'

ভাস্কর ব্যস্ত হয়ে বলল—'না, না—তা বলিনি!'

'কিন্তু বললেও তো আর ফেরান যাবে না।' কৃষ্ণা হাসল—'সুতরাং না হয় বলেছেন। এই যে আপনার চা এসে গেছে।'

ভাস্কর চায়ের প্রতি সহসা মনোযোগী হয়ে উঠল।

পাঁচু খালি ট্রে নিয়ে ফিরতে ফিরতে ডাকল—'দিদিসাহেব!'

'যাও, আসছি।' তাকে বিদায় করে কৃষ্ণা বলল—'বলুন তবে কি বলছিলেন?'

ভাস্কর নির্বাক হয়ে পেয়ালা নিয়ে ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল।

কৃষ্ণা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হেসে ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল—'তাহলে কাল কিংবা পরশু থেকে তুলি নিয়ে আসছেন, মনে থাকে যেন! এবার আর গড়িমিসি নয়। আসছি—উঠবেন না যেন।'

কৃষ্ণা ভুল ধারণা নিয়ে চলে যায় দেখে ভাস্কর ফিরে ডাকতে গিয়ে পেয়ালা থেকে মুখ তুলেই বিষম খেল। কৃষ্ণা কৃত্রিম কণ্ঠে দাঁড়িয়ে বলল—'বললামই যখন আসছি, তখন তো স্মরণ করবার প্রয়োজন ছিল না।' বলেই মুখ নামিয়ে দ্রুত চলে গেল—তার হাসি কিন্তু গোপন থাকল না। সেই তীক্ষ্ণ চিকন হাসি।

ভাস্কর শিথিল দেহ নরম সোফায় এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। অনুভব করল ধীরে ধীরে সে নেমে যাচ্ছে তলার দিকে—ক্রমাগতই নীচের দিকে। পূর্ণ পেয়ালার উষ্ণস্পর্শ তখনও ঠোঁটে লেগে।

১০

কিছুকাল অতীত হয়ে গেছে।

মমতা কিছুদিন ভাল থেকে, আবার ক'দিন অনুপস্থিতির পর আশ্রমে এসেছিল। উর্মিলা ছুটির আগে অবসর করে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল—'মমতা, শোন। ভাস্করবাবু প্রায়ই আসছেন না কেন রে?'

মমতার মুখ গম্ভীর হোল, বলল—'জানিনে উর্মি।'

'খোঁজও নিসনি? যতীবন্ধু যেমন ঘনঘন খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছেন তাতে তোর কিন্তু খোঁজ নেওয়া উচিত।'

মমতা জবাব না দিয়ে হাতের বইখানার পাতা উল্টোতে লাগল। যার সংবাদ একদিন না জানলে ব্যাকুল হয়ে যেত, ইচ্ছে করেই অনেকদিন তার সংবাদ রাখে না।

উর্মিলা বলল—'কিছু মনে করিস নে, একদিন এসেছিলেন কৃষ্ণা গুপ্তা —উনি কে? আগে তো কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না।'

মমতা অস্ফুটস্বরে বলল—'এসেছিলেন নাকি! জানতাম না তো!'

'কেউ-ই জানতাম না। ভাস্করবাবুকে কে খোঁজ করছেন শুনে বেরিয়ে দেখি তিনি। শিল্পী একটু আগে বেরিয়ে গেছেন শুনে তখনই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলেন, শেষে কি মনে করে মৃৎবিভাগের ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক সবই একটু দেখে গেলেন। মনে হোল, কেউ নিকট-আত্মীয় হবেন।'

'তাই বুঝি!' মমতা স্বগতোক্তি করল।

উর্মিলা বলল—'হ্যাঁ। হাতের প্যারিস্‌ব্যাগ থেকে সাহায্যতবিলে কিছু দানও করে গেলেন—কারও কারও সাথে আলাপও হোল। খুব ফ্রি, মোটে তো ঐ-টুকু সময় কিন্তু ওরই মধ্যে মনে হোল যেন কতদিনের চেনা। দারোয়ান তো অযাচিত বকশিস পেয়ে বশীভূত হয়ে গেছে।'

'হাঁ, তিনি খুব বশ করতে পারেন।'

'চিনিস তাহলে!' উর্মিলা মাথা নাড়িয়ে আরও কিছু শুনতে যাচ্ছিল এমন সময় অফিসের ভুতো-দপ্তরী উপস্থিত। বলল—'ম্যানেজারবাবু ডাকছেন।'

উর্মিলা বলল—'যতীবন্ধুবাবু—আমাকে?'

'না, মমতা-দিদিমণিকে।'

ভৃত্যো চলে গেল—যেন দেয়ালে ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিয়ে। খোদ অফিসের দপ্তরী—পরগৌরবকে বেশী কথা বলে ক্ষুন্ন করে ন আশ্রমে আরও কয়েকটি দপ্তরী-গোছের ছিল।

দুই বন্ধুতে দৃষ্টি-বিনিময় হোল। উর্মিলা পূর্ব-কথার সূত্র টে বলল—'তারপর ?'

মমতা বলল—'আগে শুনেই আসি, কতদিন পরে হাজরে।' ব ভাবিত মুখে চলে গেল। তার প্রায়ই অনুপস্থিত হতে হওয়ায় যে কোনকুলই বজায় থাকছিল না, তেমন দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না।

যতীবন্ধু নিজের অফিসঘরের টেবিলের উপর কখানা নক্সা, ম্যা ও বিবিধপ্রকার স্কিমের ফাইল খুলে গভীরভাবে ব্যস্ত হয়েছিলেন এমন তিনি প্রায়ই হয়ে থাকেন, কিন্তু আজকের পিছনে কিছু জটিল রহ ছিল :

কিছুক্ষণ পূর্বে উদয় রায় একপ্রকার নিঃশব্দে প্রবেশ করে য তার দ্বিতীয়দফা দানের থলিটি অনাড়ম্বরে টেবিলের উপর রেখেছি তখন যতীবন্ধু সহসা অর্থচিন্তা থেকে মুখ তুলে উচ্ছ্বসিত হ উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল প্রাথমিক কুশল জিজ্ঞাসায়। তার যতীবন্ধু অনুরুদ্ধ হয়ে থলিটি টেবিলের টানায় রাখতে রাখতে বললেন- 'অন্ততঃ কি আপনার নামপ্রকাশার্থ অনুমতি পাব না ?'

'বলেছি-ই তো, নামের জন্যে দেওয়া নয়।'

যতীবন্ধু কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো বসে থাকলেন। শেষে বললেন- 'তবে থাক। আপনার অভিলাষের আর অমর্যদা করব না। তবে ধর কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এঁদের অবগতির জন্যেও—'

'ঠিক সেই জন্যেই নয়।' উদয় উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল। বলল-

অমনি সুরু হবে আন ফুল, আন মালা, অভিনন্দন, অভ্যর্থনা—হয়রান হয়ে গেছি বন্ধুবাবু। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানে তার প্রয়োজনই বা কি!'

মুগ্ধ যতীবন্ধু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—'প্রয়োজন কি একেবারে নেই?'

'আছে কি—ভেবে দেখুন তো!' উদয় রহস্যভরে মাথা নাড়ল—'না, আমি বলি—নেই। তাছাড়া এমনও তো নয় যে আর আসব না!'

'বেশ। তবে কি উদ্দেশ্যে দান, কারও স্মারক কি না, আমাদের অনেকগুলি বিভাগ আছে, টাকা কোনটার হিসেবে জমা করব—সেও কি বলবেন না? আমাদের সেটুকু অনুগ্রহ থেকেও বঞ্চিত করবেন?'

'এখানে উদ্দেশ্য বলা আর চাওয়া যে নামান্তর। দান করে প্রতিদান নেব-ছি-ছি।' বলে উদয় কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর যেন যতীবন্ধুর ক্ষুণ্ণ চেহারা লক্ষ্য করে বলল—'আপনি প্রকাশ করবেন না?'

যতীবন্ধু ঘাড় নাড়লেন।

উদয় বলল—'শুনেছি আপনাদের নাকি কি-একটা শিল্পবিভাগ আছে। মাটির বাসন, পুতুল, মূর্তিগড়া, ছবিআঁকা এসব করা হয়। যখন বলছেন তখন সেখানেই না হয়—'

যতীবন্ধু মনের উল্লাস চেপে বলে উঠলেন—'সুন্দর, উত্তম প্রস্তাব।'

"এক কাজ করবেন?' উদয় যেন কথার ঝোঁকে উৎসাহী হয়ে উঠল—'বিভাগটাকেই নাহয় বড় করে গড়ে তুলুন না! নতুন শিল্পী নতুন কারিগর নিয়ে! তার জন্যে টাকাও লাগে আরও দেব।'

'আমি এখনি লিখে নিচ্ছি।' যতীবন্ধু ব্যস্ত হয়ে শিল্পের ফাইল হাতড়াতে লাগলেন। তিনি জানেন এরা যখন ঝোঁকের বশে কথা দিয়ে বসে তখন সেটা পাকিয়ে নিতে দেরি করতে নেই।

উদয় বলতে লাগল—'দেখুন বললেন কিনা, তাই বলতে বাধা

নেই। এ বিষয়ে আমার একটা দুর্বলতা আছে। একটা হারাবার ব্যথ
এর সঙ্গে জড়িত। সে একদিন আর যাই থাক আজ শুধু ছা
মূর্তি-ভাস্কর্যের মধ্যে জড়িয়ে আছে। যাকে পুরোপুরি আর পাওয়া যাবে
না, তাকে এভাবে তবুও পেতে পারি। মন একদিন শান্তি পেতে
পারে।' বলতে বলতে উদয়ের চোখমুখ উদাস হয়ে গেল, বলল—
'দেখবেন যদি হয়।'

যতীবন্ধু যেন মনোব্যথায় একমুহূর্ত লেখা থামালেন, বললেন—'অন্ত
দেখছি ব্যবস্থা যাতে হয়।'

উদয় আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল—'তবে এ
কথা ঠিক, আমি যাই ?'

যতীবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন। বললেন—'বলুন যে 'আসি'
আচ্ছা', নমস্কার!' তার লেখা তখনও শেষ হয়নি কিন্তু তিনি দেখছিলে
এই লোকটির আসাও যেমন আপন ইচ্ছায়, কতকটা যেন গোপনে
যাওয়াও তেমনিভাবে। দ্বিরুক্তি করলেন না।

উদয় দরজার নিকটে পৌঁছে একবার ফিরে দাঁড়াল—'দেখবেন যে
ঢাক পিটোবেন না—আচ্ছা, আচ্ছা!' সে হেসে চলে গেল।

যতীবন্ধু ডাক ছাড়লেন—'ভুতো!'

তারপর বসে পড়ে অকারণে টেবিলের টানাটায় একটু টান দিলে
লেখা কাগজখানা একটু উলটে পালটে দেখলেন, রসিদবইখানা ছুঁড়ে
পৌঁছে দিলেন যথাস্থানে। ভুতো এসে দাঁড়াল। যতীবন্ধু খোসমেজাজে
জিজ্ঞাসা করলেন—'তারপর ভূতনাথ, কাজকর্ম কেমন চলছে
তোমাদের ?'

'চলছে।'

'চলছে কি রে, বল দৌড়চ্ছে—ধাবন্তি।'

'তা যদি বলেন—'

'তোমার বক্তৃতা শুনতে হবে?' যতীবন্ধু হেসে উঠলেন, বললেন—অর্বাচীন। ভাস্করবাবুকে ডেকে দে। কি হোল নড়ছিস নে?'

'তিনি আসলে তবেতো নড়ব।' নীরব হতে হওয়ায় ভুতনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

'আসেননি! জানিস্ ঠিক?'

'ভূতনাথ না জানে কি—নিজের কপাল ছাড়া। যার কথা বলছেন তিনি কালও আসেননি, পরন্তু অর্ধেক এসেছিলেন, তার আগের দিন—'

'আসেননি। তুই এক কাজ কর।' যতীবন্ধুকে চিন্তিত দেখালেও বিষণ্ণ দেখাল না, বললেন—তুই মমতা-দিদিমণিকে ডেকে দে, সে এসেছে। বলিস, সম্পাদকবাবু ডাকছেন।'

মমতা এসে দেখল যতীবন্ধু নক্সা ম্যাপ আর স্কিমের সাগরে ডোববার উপক্রম হয়েছেন। সে এলেও তিনি মুখ তোলার অবকাশ পেলেন না। শুধু বললেন—'এস, মমতা এস'

মমতা অপেক্ষা করতে লাগল।

'বোস।'

'দাঁড়িয়েই বেশ আছি, বলুন।'

এবার যতীবন্ধু মুখ তুললেন। চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ হাসতে লাগলেন—'তা বটে, নিরাময় হয়েছ দেখছি। বয়সও নবীন।' শেষে হাসির বেগ কমিয়ে বললেন—'মাঝে মাঝে চিত্তে একটা সাধ হয়, মমতা, এই যতীবন্ধুর হিসেবে যদি মাঝে মাঝে অল্প অল্প প্রমাদ হোত! [illegible] করতে পারত এজগতে অদ্যাপি কিছু দেখতে বাকী আছে। কিন্তু প্রমাদ হয় না।' বলে একদণ্ড যেন দুঃখ প্রকাশ করতেই থেমে রইলেন।

মমতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যতীবন্ধু বলতে লাগলেন—'মাঝে মাঝে ভাবি অনেকই তো দেখলাম বললাম, সে সব অভ্রান্তও হোল। এবার ছুটি নেব। তাতে কারও কারও সুবিধে হতেও পারে। কিন্তু কাজ ছাড়লে হবে কি, কহ্‌লি ছোড়তি নহী।'

ভুতো বলল, আপনি আমায় ডেকেছেন।'

'বলেছে বুঝি! তাহলে হবে।' ঘড়ির দিকে চেয়ে যতীবন্ধু সহসা যেন আসন্ন ছুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠলেন—'ওহো, তাড়া আছে দেখছি। ছুটি হয়ে আসছে, একত্র বাড়ি যাবার সময়ও হোল। কিন্তু কদিন যেন ভাস্করবাবুকে দেখছিনে বলে মনে হচ্ছে?'

মমতা আরক্ত মুখে চুপ করে রইল।

যতীবন্ধু বলতে লাগলেন—'দুজনে একত্রে পথচলা দিব্যি। পথেও নিশ্চিন্ত, কথাবার্তায় ক্লান্তি বোধও হয় না—তাঁর কি অসুখ করেছে?'

মমতা আর সইতে পারল না। বলল—'আমাদের বাড়িতো এক নয়।'

যতীবন্ধু হাসলেন—'এ হোল ক্ষোভের কথা, তুমি কি রাগ করছ?'

'আমি কি রাগ করতে পারি?'

যতীবন্ধু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। বললেন—'বেশ, তাহলে জিজ্ঞাসাই করছি। ভাস্করবাবুর সংবাদ কিছু জান—জান না? কদিন আসছেন না। অবশ্য ইদানীং তাঁর সে সুবিধে প্রায়ই হয় না। কিন্তু আমরাতো শুধু শিল্পলোকে বাস করিনে। অত্যন্ত কঠিন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলতে হয়—কাজ দিতে হয়, কাজ নিতে হয়। এমন চলবে না।'

'বেশ। খোঁজ নেব।'

'হ্যাঁ, নিও।' যতীবন্ধু হাসলেন—'আর নেবেই তো, জানতামও! মাঝখান থেকে মিছেমিছি রাগ করে নিয়ে—দেখ দিকি তোমারও কত বিলম্ব হয়ে গেল!'

মমতা আর কথা না বলে বেরিয়ে চলে এল। বিক্ষুব্ধ মুখে চোখদুটো ছলছল করছে। কোনদিকে ফিরেও চাইল না, উর্মিলার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করল না। সে বুঝছিল তার এতদিন অভিমান করে উদাসীন থাকার জরিমানা তাকে কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে। তবে আর বিলম্ব কেন!

মমতা যখন আকুল মনে ঝাউবীথির নীচে এসে পৌছল, তখন দিনের আলো বিলাপরত চোখের মতো লাল হয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড ঝাউগাছগুলির শোঁসানি সান্ধ্য হাওয়ায় ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠছিল। এবং তাদেরই শাখাপল্লবের মধ্যে বসা শঙ্খচিলদের উগ্র করুণ সুর থেকে থেকে সন্তপ্ত বিলাপের মতো ধূসর আকাশে ভেঙে পড়ছিল। কাদের যেন ক্রন্দনরত অদৃশ্য প্রাণসমষ্টি।

মমতারও আর্দ্র মনে না হয়ে পারল না যে, এখানকার এই বাতাস এই স্তব্ধ-ভারী আবহাওয়া যেন জীবন্ত। এ যেন ভৌতিক কিছু। কি একটা অব্যক্ত চেতনা যেন কেবলমাত্র ব্যক্ত হতেই এর স্তরে স্তরে কেঁদে ফিরছে।

গাছগুলির পাশে পতিতভূমির পর ঘনকৃষ্ণ ছায়াশ্রেণীরও সমাবেশ হচ্ছিল। মমতা তাকিয়ে রইল। অতীতে মুমূর্ষু যে-নরনারীর সুদীর্ঘ স্রোত এই সুপ্রাচীন বৃক্ষগুলির সুমুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শেষে এদেরই বিশাল শাখাপ্রশাখায় স্মৃতি হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের প্রেতাত্মারা যেন সময় আগত দেখে একে একে গাছের গুড়ি বেয়ে নেমে নিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে। এখনই ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সুমুখের ঐ সমবয়সী অট্টালিকার অবশিষ্ট প্রাণটুক আত্মস্থ করবার অভিযান চালাবে!

মমতার আকুলতা কোন সান্ত্বনা পেল না। কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে ব্যস্ত অথচ শিথিল পায়ে উদ্যানের সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হয়ে গেল। পথিক যেন পথের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট নিশ্চিত নয়।

উদ্যান পেরিয়ে লম্বা বারান্দা অতিক্রম করতে করতে সে সহসা থমকে দাঁড়াল। গুঞ্জনগানের শব্দ শুনছে না! নিস্তব্ধ অট্টালিকার সান্ধ্য আবহাওয়ায় একটা চাপা গানের ক্ষীণ সুর থেমে থেমে কিছুক্ষণ ধরে স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। সেই শূন্য বিজন পুরীতে দিনের শেষে সেই গুনগুন সুর যেন বিভীষিকার মতো। মমতা সহসা বুঝতে পারল না এ-বাড়িতে গাইবার মতো লোক এল কোথা থেকে। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যখন বুঝল যে গাইছে স্বয়ং ভাস্কর এবং তার শোবার ঘর থেকে তখন নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে বাধল। ভাস্কর গান গায়! তার মুখে আর কোনদিন শুনেছে বলে মনে পড়ল না।

সে সোজা শোবার ঘরের দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হোল, চমকিত হোল। গুঞ্জন থেমেছিল। জানলা সব প্রায় বন্ধ থাকে বলে ঘরখানা প্রায়ান্ধকার। একটা মাত্র খোলা জানলা দিয়ে ওপাশের পশ্চিম আকাশ ছলছল করছে—অস্তোন্মুখ অতীত দিনের সিন্দূরবর্ণ উজ্জ্বল একটা চৌকো চোখের মতো। সেই আলোর বিপরীত দিকে ভাস্করকে দাঁড়ান দেখতে পেল, তারই হুবহু ছায়ামূর্তি যেন। বাইরের দিকে চেয়ে নিশ্চল হয়েছিল, বিস্মৃতের মতো হাতে তখনও চিরুনিখানা ধরা।

মমতার পায়ের সাড়ায় ভাস্কর চমকে ফিরে দাঁড়াল। ছায়াকালো মুখের উপর পলকের জন্য সাদা দুটো চোখ বিস্তৃত হয়ে একবার স্বচ্ছ দেখা গেল।

মমতা একনিমেষে বুঝতে পারল, ভাস্কর যথারীতি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। বোধহয় যেতে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে অস্তসূর্যের ছটার

প্রতি তাকিয়ে ছিল। মমতা তার নতুন সাজগোজ বেশভূষার প্রতি চকিতদৃষ্টি ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল—'আমি যে আশ্রম থেকে সোজা এখানেই চলে আসছি!'

মমতার মনে হোল সে যেন এক কালো সুড়ঙ্গের মেঝে দিয়ে সুড়ঙ্গের একটামাত্র মুক্তগবাক্ষের অভিমুখে ধেয়ে আসল, যে গবাক্ষ আগলে আছে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্টমূর্তি।

সেই মূর্তি এক তিলও না নড়ে বলল—'কেন?'

'বোঝেন না! আপনার কি হৃদয় নেই?'

'হৃদয়!' মূর্তির আবছা মুখে মনোভাব বোঝা গেল না, কিন্তু সে উত্তর স্পষ্ট দিল—'আছে বটে। আমি তো পুতুল নয়। হৃদয় আছে বলেই কারও নির্দোষ নিমন্ত্রণে না গিয়ে পারিনে—না গেলেই হোত দোষ!'

'মানলাম।' মমতা মুখ নামিয়ে নিল—'কিন্তু সেতো সকালে কিংবা সন্ধ্যায়। তাতে দুপুরে আশ্রমে যেতে বাধাতো ছিল না। শিল্পী! সব যে পণ্ড হয়ে যাবে!'

ভাস্কর জানলা দিয়ে আকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল—যেন যার যা অভিপ্রায় তা সে বলে যেতে পারে!

মমতা বলল—'শুধু আশ্রম নয়। আপনার এই বাড়ি? লক্ষ্মীর আসন? একে যে মুক্ত করতে এখনও অনেক বাকি, এখনও অনেক দফা ঋণপরিশোধ করতে হবে!'

ভাস্কর জবাব দিল না।

মমতা বলতে লাগল—'আর উমানাথের সেই ফরমাস? তাঁর স্নেহ, তাঁর বিশ্বাস? সেতো শুধু তাঁর নয়, সারা দেশের সকল মানুষের। আপনারও এতদিনের সেই আনন্দ ছিল। ভেবে দেখুন কত কিছু নির্ভর

করছে আপনার পরে—কত বড় গুরু দায়িত্ব!' মমতার কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করতে লাগল।

ভাস্কর জানলা থেকে মুখ ফিরাল না। দুজনের মুখ দেখাদেখিতে কোথায় যেন বাধা আছে। বলল—'কেন এত কথা, কদিন আশ্রমে যাইনি বা দেরি হয়েছে বলে? বুকের সেই ফোলাটা আবার বেড়ে যাওয়ায় ভাল ছিলাম না।'

মমতা ব্যথা পেয়ে চমকে নীরব হোল। সেই নিঃশব্দতা দেখাল যেন সে অসুস্থতার সংবাদ বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছে। একটু পরে বলল—'কিন্তু আচার্যদেব বা আপনার বন্ধু তাঁরা সেকথা জানেন না, তাঁরা কি ভাববেন? যতীবন্ধু তো ক্ষেপেই উঠেছেন 'সব গেল—সব গেল' বলে!'

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ভাস্কর জবাব দিল—'আমি তো কারো দস্তখত-করা গোলাম নয়!

এমূর্তি মমতা চিনত না, এমন উত্তরও সে ভাবতে পারেনি, তার বুক সহসা কেঁপে গেল। তবু বলল—'কিন্তু আপনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই যে তাঁরা বলছেন—এ তো ঠিক, এ তো সত্যি?'

'না, সত্যি নয়।'

'সত্যি তবে কি?'

'এসব কোন কথাই ওঠেনি। আসলে তাদের সুমুখে রেখে কথা বলছ তুমি—সংকীর্ণ তোমার মন, ক্ষুদ্র তোমার ঈর্ষা!'

'শিল্পী!'

'হ্যাঁ, তুমি। আর এসমস্তই তুমি কৃষ্ণা গুপ্তাকে ঈর্ষা কর বলে!' বলেই আবার জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মমতার মাটির দিক থেকে চোখ তুলতে দেরি হতে লাগল। কিন্তু

যখন তুলল সেতুটি জলে ভেসে গেছে। বলল—'ভুল হয়েছিল। যে অনে উঁচুতে তার পতনের গতিও এমনই দ্রুত।' মমতার গলা ভেজা।

'পতন ?'

'পতন নয় ? যা আজ মুখে বাধল না—এ একদিন উচ্চারণ করে পারেন বলেও কি ভেবেছিলেন ? একদিন কি ভেবেও ছিলেন সাম্যে মূর্তি পড়ে থাকবে ওই অমন করে বিলাসমূর্তির পাশে ? আশ্রম হ বেগার ? বোধ হয় না। তবু পতন নয় ! যাক্—' মমতা অধর কামে নীরব হয়ে নিজেকে সামলাতে লাগল।

ভাস্কর স্থির হয়ে থাকল।

মমতা পরে ধীরে ধীরে বলল—'যাক, এ বোধহয় ভালই হোল মেঘ ঘনিয়ে এসেছে আমাকে ঘিরেও—আমিও ভাল নেই। মা ছিলেনই, অনেকদিন হোল উদয়বাবুও উপস্থিত—ওদের উল্লাস আ চাইনে, চাইনে, বাধা আমাকে দিতেই হবে। যে করে হোক। তবু—

'তবু ?'

মমতা জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলে সহসা এগিয়ে এসে বলে উঠল- 'এযে ঝগড়া। শুনছেন, এমন করে ঝগড়াতো আমরা করতে পারি —এ যে হীন!'

কিন্তু দেখল সেই আবছা নিশ্চলমূর্তিতে কোন রেখাপাত হোল না। সে যেন কালো পাষাণে গড়া। কোন কিছু সে চোখে দেখেনি, কানেও শুনল না। কেবল ঈষৎ নড়ে পুরোপুরি সো হয়ে দাঁড়াল, যেন সে যা বলেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাই-ই রক্ষ করতে চায়।

সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে অটুট নিঃশব্দতার মধ্যে দুটি হৃদয় কয়েব মুহূর্ত যেন পরস্পরের হারান গ্রন্থি সন্ধান করে অপেক্ষা করে রইল

তারপর মমতা সহসা 'ওঃ!' বলে চকিত হয়ে উঠে যেমন এসেছিল তেমন প্রত্যাহত ঢেউয়ের মতো দ্রুত চলে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছিল।

মমতা তাদের বাইরের ঘরে পৌঁছলে উদয় উঠে হাত জুড়ে বলল—'নমস্কার!' ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন। বিলম্বজনিত ত্রুটি দেখানই তাঁর অভিপ্রায়।

'নমস্কার।' বলল মমতাও, কিন্তু বুঝতে পারল মনটা যেন ভাঙা মাটির পাত্রের মতো কেবলমাত্র জোড়া দেওয়া আছে। এখন আর বিন্দুমাত্র নাড়াও তাতে সইবে না। তাড়াতাড়ি বলল—'আসছি। এগুলি বদলে-ছেড়ে রেখে।' বলে বাইরের বেশ-ভূষার পর দৃষ্টি দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

উদয় হাসতে লাগল—'ভাল কথা। অপেক্ষায় অরুচি নেই আমার।'

কিছুক্ষণ পরে মমতা যখন সত্যই বাইরের কাপড়-চোপড় বদলে মায়ের কাছে উপস্থিত হোল—এ-সময়ে যা সে কখনও করে না—বসুমতী বিস্মিত হয়ে [illegible]। বললেন—'কি হয়েছে রে?' তিনি বাইরের জন্য চা বানাচ্ছিলেন।

'কিছুই হয়নি তো।' মমতাও দুধ-চিনি নিয়ে তাঁর সাহায্যে লেগে গেল।

'কিছুই না?' বসুমতী তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। অনেক দিন হয়ে গেছে ভাস্কর আসে না, মমতাও সেদিক মাড়ায় না—এ-সব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

মমতা ঘাড় নাড়ল।

বসুমতী আর জেরা করলেন না, বললেন—'কিছু না-ই তো, সব উড়োমেঘ। সূর্য যে চিরদিনের সেটা বলতেই ওদের এত ঘোরা-ফেরা।'

মেয়ে কথা বলল না। সেও যে মায়ের সঙ্গে এক মত, অর্থাৎ 'কিছুই হয়নি তো' বোধহয় একথা প্রতিপন্ন করতেই আজ চা বানান হলে পেয়ালা দুটো নিয়ে নিজেই বাইরে চলে গেল।

বসুমতী অবাক হলেন। মেয়েকে বাইরের ঘরে চা দিয়ে পাঠাতে বিশেষত উদয় থাকলে প্রাণান্ত হোতে হোত।

উদয়ও প্রথমে বিস্মিত হোল, পরে বিমুগ্ধ হয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল—'আহা আপনি—আপনি কেন—দেখুন তো দিকি!'

'কেন, এ-তো অতিথির জন্যে সবাই করে! বসুন।' মমতা জোর করে একটু হাসল।

১১

কৃষ্ণার হাসি আর ধরে না। তার হাসি যেন তরল উল্লাসের ফোয়ারা, কিছুক্ষণ কলকণ্ঠে শতমুখী হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। শেষে বলল—'বাব্বা, এতদিনে তবে শেষ হোল।'

ভাস্কর লালকুঠিতে তার একখানা প্রমাণ ছবিতে হাত দিয়েছিল। সেটা দীর্ঘসময় নিয়ে শেষ হয়ে আসায় কৃষ্ণা উল্লাস জানাতে লাগল, কিন্তু তখনও কিছু বাকী থাকায় আসন ছেড়ে উঠতে পেল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেও আজই শেষ করবার আগ্রহে ভাস্কর তুলি নিয়ে দ্রুত হাতে কাজ করছিল।

কৃষ্ণা ভ্রূ-ভঙ্গি করে কৃত্রিম অসহিষ্ণুতা জানাল। কিন্তু ভাস্করের একাগ্র দৃষ্টি তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোল না।

এটি কৃষ্ণার নিজের ঘর। ঘরময় নীলাভ উজ্জ্বল আলো, জানলার পাশে একটা কোচের টপে হেলান দিয়ে তাকে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে

হয়েছিল—একটি মাত্র আবক্ষ ব্লাউস গায়ে, গোলাপী শাড়ির আঁচল আলগোছে বুকের উপর উপুড় হয়ে আছে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ এসে গরাদহীন জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে লাগলে সে উঠে চলে এল—'দোহাই এবার শর-সংবরণ করুন, রাখুন আপনার তুলি!'

কাজে বিঘ্ন ঘটায় ভাস্কর কপাল কুঞ্চিত করে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণা তাতে অপ্রতিভ হোল না। ছবিখানা নানাভাবে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল—'ধন্যবাদ, মুখখানা বেশ সুন্দর এঁকেছেন।'

'আঁকবার মতো সুন্দর মুখ আপনার আছে বলেও ধন্যবাদ।' ভাস্কর শুকনো স্বরে সৌজন্য জানাল।

'তাই বুঝি!' কৃষ্ণা হাসির সঙ্গে শরম মিশাল। বলল—'ওকি ও-সব গোটাচ্ছেন যে?'

'আর খুলে রেখে লাভ। মিছে আজ শেষ করতে দিলেন না, শেষ হয়ে যেত।'

ভাস্করের মনে আবার কিছুদিন থেকে মেঘলা চলেছিল। সে অনেক-দিন হয়ে গেলেও একটা বিষণ্ণ-মূর্তির চলে যাবার ছবি কিছুতে ভুলতে পারছে না।

'বাঃ রে, তা হবে না।' কৃষ্ণা বলল—'কিছুটা নড়েচড়ে আবার বসব। জানেন, ক্লাবের কি একটা লোভনীয় পার্টি আজ ছেড়ে দিয়েছি? বাবা যাবেন, মিস্ পাউয়েল পর্যন্ত যাবেন।'

ভাস্কর রঙ-তুলি গোটাতে লাগল।

দেখে কৃষ্ণা আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল—'আপনি কি মানুষ বলুন তো! এই তো একটু আগেও যাকে আপনার ছবি আঁকার ছাঁচ চাইছিলেন সেই পুরো মানুষটা এখন আপনার সামনে কিন্তু—না তা হবে না। কেবল কি ছবিই আঁকবেন? মানুষের কি গল্প-সল্প নেই,

কোন শখ নেই? আপনার কাছে জীবন কি কয়েক পোঁচ কালি আর গোটাকতি টান?'

'সে কথা তো হচ্ছে না।'

'সেই কথাই হচ্ছে। আপনি তাই বলছেন, আপনি তাই ভাবেন?' কৃষ্ণা তার চোখের কোণ নিখুঁতভাবে ছলছলিয়ে আনল।

ভাস্কর বলল—'না। বরঞ্চ উল্টোটাই বলি, বিশ্বাস করি। কালি আর তুলির টানে তাকে বাঁধতে চাই যা তাদের মধ্যে নেই। নাহলে শুধু কালি কলঙ্ক হোত।' একটু থেমে বলল—'কেবল এদেশে তার 'আদর্শ' পাব ভাবিনি কোনদিন।'

কৃষ্ণা যেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—'অন্ধ!'

তার রাগের গুঞ্জন দেখে ভাস্কর একটু হাসল। বলল—'হ্যাঁ, আগে আপনাকে দেখিনি বলে বলতে পারেন। তা ঠিক। এর আগে কখনো ভাবতে পারিনি, আপনার মতো মেয়ের দেখা এদেশের মাটিতে আমি পাব। যদি সাহায্য করেন উর্বশীকে মাটিতে গড়তে পারি।'

'আমি তো না বলিনি।'

'তাইতেই তো। আপনার সঙ্গে দেখা হলে মনে হয়েছিল—ইনি যে আমার চেনা, এঁকে যে অনেকদিন ধরে খুঁজছি।'

কৃষ্ণা আরও নিকটে এসে তুলি নিয়ে ঘনিষ্ঠের মতো নাড়া-চাড়া করতে লাগল। বলল—'এ সত্যি আপনার মনের কথা? আপনাকে এমন করে আর কেউই জাগিয়ে দেয়নি?'

ভাস্কর সহসা নীরব হোল।

কৃষ্ণা বলল—'বলুন ভাস্করবাবু!'

ভাস্কর ঘাড় নাড়াল—না।

'কোন মেয়েই নয়?'

'না।' ভাস্কর তুলিগুলো জড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ উঠে পড়ল।

বাইরে থেকে ডাক এল—'বেবি!'

'কাম্ ইন্! এস এস দেখবে এস!' কৃষ্ণা ডাকল।

মিস্ পাউয়েল ভিতরে এলেন—'চিয়ার্ ইয়ু! গুড্ ইভ্নিং আর্টিস্ট!'

অবনগুপ্ত পিছন থেকে এগিয়ে এলেন—'ওকি, বেবিও আঁকছে নাকি?'

কৃষ্ণা তুলি নিয়ে নিজেকে বিধিমত ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। সে কৃত্রিমভাবে ভাস্করকে শাসাল। কিন্তু ভাস্কর জবাব দিল—'হ্যাঁ। যাতে না আঁকতে পারি সেটা দেখছেন।'

মিস্ পাউয়েল কৌতুক লাগায় মন্তব্য করলেন—'প্রেটি, ভাল্ ফর্ হার্!' কৃষ্ণাকে বললেন—'তাহলে তুমি গেলে না! কুঠিতেই থাকছ? আমরা কিন্তু যাচ্ছি।'

'ওঃ, মিস্ পাউয়েল।' কৃষ্ণা যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওরা ব্যস্ত ছিলেন। অবন গুপ্ত ফিরতে ফিরতে ভাস্করকে বললেন—'তুমিও তো আছ কিছুক্ষণ?'

ভাস্করকে মাথা নাড়তে হোল। ওরা চলে গেলেন।

ঝপ্ করে শোফায় বসে কৃষ্ণা বলল—'থাকুন এবার পাহারা হয়ে বসে।'

'দরকার নেই আমার।'

'কিন্তু আমার তো আছে!' কৃষ্ণা ঘাড় ফিরিয়ে হাসি লুকাল—'সন্ধ্যা উতরে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, একলা অরক্ষিত অবলা—অতএব কেবলমাত্র বসে বসেই হিরো হয়ে থাকুন।'

'হাসছেন আপনি?'

'না, মোটেই না।' কৃষ্ণা নিজেকে গম্ভীর দেখাবার ভান করে বলল—'বরঞ্চ মনে মনে শিল্পীরই একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করছি—

সাধু, অতি ধার্মিক, নিরামিষাশী, রঙ ভিন্ন অন্য কিছু দেখেন না বোঝেন না—'

'কৃষ্ণাদেবী!'

'জী, কিছু বাদ পড়ে গেছে?'

ভাস্কর বসে পড়ল অসহায়ের মতো। আকাশে বান ডেকেছে জ্যোৎস্নার। ঘরময় নীলাভ আলো। অপেক্ষাকৃত নির্জন কুঠি যেন এরই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, কেউ যেন অপরের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না। সহসা কৃষ্ণা যখন কথা বলল তার গলা শুনে বিস্মিত হতে হয়—কিছুপূর্বের তারল্য তাতে বিন্দুমাত্র নেই। কৃষ্ণা গাঢ়স্বরে ডাকল—'শিল্পী!'

ভাস্কর মুখ তুলে তাকাল, কোন কথা বলতে সাহস পেল না।

'মেয়েদের কথা আপনি বড় একটা ভাবেন না, নয়?'

ভাস্কর তাকিয়ে রইল, আলোয় কৃষ্ণা ক্রমেই লীলাময়ী হয়ে উঠছিল —কথা বলতে গেলেই সহসা বুকের রক্ত ক্ষেপে গিয়ে যেন কথা আওড়ে আত্মহারা হবে।

কৃষ্ণা হঠাৎ হেসে মুখ নামিয়ে নিল—দুই গালে শরমের দুটি অনুপম টোল।

পরক্ষণে ভাস্কর উঠে দ্রুতপায়ে অলিন্দে চলে গেল—যে-রক্ত ছাব্বিশটা বছর শান্ত ধারাতে বয়ে চলছিল সে যেন সহসা আজ একদিনেই ক্ষেপে উঠতে চায়। রক্তের গতি শান্ত না করে নিলে বুঝি সহজ ভাবে কথা বলাও আর সম্ভব হবে না।

কৃষ্ণাও পিছন পিছন বেরিয়ে এল।

ভাস্কর মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কি চাই?'

'অর্থাৎ আমাকে চাইনে!' কৃষ্ণা অদ্ভুত করে হাসল, বলল—

'আমি কিন্তু নিষ্পাপ। ভাবলাম ওঁরা বাড়ি নেই—অতিথির কাছে কাছে থাকা দরকার—নাহলে অসম্ভব নয় যে কর্তব্যের হানি করা হবে!'

'দেখছেন কি আশ্চর্য সন্ধ্যা—কত বড় চাঁদ?'

'কোথায়, দেখি।' বলে কৃষ্ণা দেখার ভান করে এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

ভাস্কর ভ্রূকুটি করল।

কৃষ্ণা বলল—'ভয় নেই, আক্রমণ করব না।' বলে সে একটু হাসল—'ছোটবেলায় ওরা আমাকে লক্ষ্মী-মেয়ে বলে ডাকত। বলত—কৃষ্ণা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।'

রক্ত আবার ক্ষেপতে লেগেছে, ভাস্কর কথা বলল না।

কৃষ্ণা একতিলও না সরে বলল—'আশ্চর্য সন্ধ্যা—হবে! কিন্তু সন্ধ্যাকে আশ্চর্য ভাবিনি কোন দিন। আশ্চর্য র‍্যাফেল টাওয়ার, আশ্চর্য সোনার পাথর। কিন্তু যে সন্ধ্যায় চারদিকে জ্যোৎস্না নেমেছে—যে সন্ধ্যা গোধূলি, তাকে কি ঐ একটুখানি কথা 'আশ্চর্য' দিয়ে বোঝান যায়! সন্ধ্যা রহস্যময় কামনাময়—সন্ধ্যা লগ্ন—'

'কৃষ্ণা!'

কৃষ্ণা ফিরে তাকিয়েই মুচকি হেসে ঘরে চলে গেল।

তার হাওয়ায় ওড়া কুন্তলগুলি ভাস্করের গণ্ডদেশকে স্পর্শ করছিল, ভাস্কর গালে কয়েকবার আঙুল বুলিয়ে মুছতে লাগল যেন তখনও সেখানে ছোঁয়া লেগে আছে। তারপর সেও দ্রুত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল—তার নাভিমূল থেকে গলা পর্যন্ত তখন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে গেছে। ভাস্কর বিস্মিত হোল। কারও পক্ষে এরই মধ্যে গোটাকত নিবিয়ে দিয়ে অমন করে সোফার প্রান্তে

চোখ বুঁজে হেলে বসা সম্ভব কিনা বুঝতে পারল না। থমকে ভাবছে, কৃষ্ণা চোখের পাতা মিটিমিটি খুলেই আবার বন্ধ করে নিল।

ভাস্কর হেসে এগিয়ে গেল—'ক্লান্ত ?'

'কারও মুখ থেকে একটানা স্তোত্রপাঠ শুনে শুনে ক্লান্ত হওয়াই উচিত ছিল—বসুন।' কৃষ্ণা সোফার বাকী অর্ধেক দেখিয়ে দিল।

ভাস্কর ইতস্তত করতে লাগলে কৃষ্ণা বলল—'কি হোল। মহিলার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ?'

ভাস্কর আলগোছে বসল।

'বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসুন। হ্যাঁ—এবার বলুন অমন করে তাকাচ্ছিলেন কেন ?'

'তাকিয়েই যদি থাকি তাতে হয়েছে কি !'

কৃষ্ণা বলল—'আমার একটা থিওরি আছে, শিল্পী যখন তাকায় তখন সে লোভ করে।' কৃষ্ণা ভাস্করের একখানা হাত তুলে নিল হাতের মধ্যে।

'হ্যাঁ লোভ করে, কিন্তু আঁকতে।'

'কি বললেন ?'

'আঁকার যোগ্য কিছু পেলেই শিল্পী আঁকতে চায়।'

হাত ধরা রইল হাতে, কৃষ্ণা নির্বাক হয়ে গেল। তারপর সহসা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল—'আঁকতে ! না, না—আমি জানি আপনি শিল্পী, আপনি প্রতিভা, আপনি অনেক কিছু গড়েছেন যা অমর—খ্যাতি আপনার ছড়িয়ে পড়ুক দেশ-বিদেশে তাও আমি চাই—কিন্তু, কিন্তু'—হঠাৎ সে সোফার হাতায় মুখ রেখে যেন ভেঙে পড়ল—'জানিনে, কি চাই আমি জানিনে !'

ভাস্কর তেমনি ভাবেই বসে রইল। টেনে নিল না হাত, কিন্তু সে

সত্ত্বেও বসল না। চারদিক চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় ঝিম ঝিম করতে লাগল।

১২

রাত হয়েছিল গভীর, চাঁদ হেলে এসেছে পশ্চিমে জানলায়, এককালি জ্যোৎস্না আঁধার ঘরের নিস্তব্ধতায় ঢুকে পড়ে মেঝের খানিকটা আলোকিত করে তুলেছে। তার আভায় পাশাপাশি দু'টি প্রাণীই অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল।

সহসা সুষুপ্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দু'টো শব্দের একটা থেমে গেল— পাশের ঘরে চুপি-চুপি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লোচনের ঘুম ভাঙলেও সে কিছুক্ষণ ঘুমন্তের ভান করে নিঃশব্দে চোখ বুঝে পড়ে রইল। ভয় তার রক্তে, চোখের পাতা অবধি খুলতে পারল না। শেষে ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে সনাতনের নিদ্রিত মুখ চেপে ধরেই উঠে বসল—তাকেও তুলে বসাল।

সনাতন প্রথমটায় আগুন হয়েছিল, পরে সেও কান পেতে পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। লোচন পাংশু মুখে তাকাতে লাগল তার দিকে আর ঘরের কোণে কমিয়ে রাখা আলোর দিকে, বাসনা—সেটাকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আলোর পাশে আঁধার যেন আরও গাঢ়, কাছেই রশ্মি ঠিকরে পড়ায় জলের কালো কুঁজোটা দেখাচ্ছে নাক-চোখওলা কাটামুণ্ডের মতো।

পায়ের ধ্বনি শোনা গেল পাশের স্টুডিয়োতে।

উভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ যেন লোকালয়ের বাইরে কোন

পরিত্যক্ত ভৌতিক পুরী, রাত্রি নিশীথ এবং তারা একান্ত নিঃসহায়। লোচন সখেদে ভাবতে লাগল—মৃতদের অমন অবিকল মূর্তি-গড়া তার বিবেচনায় কোনদিনই ভাল লাগেনি। গভীর রাত্রে বিদেহ আত্মারা যখন মর্তে নেমে আসেন, তখন জীবিতকালের হুবহু খাঁচাটা পেলে ঢুকে পড়বার শখ হওয়া তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। পায়ের শব্দ ক্রমে দূরে গেলে, সে মরিয়া হয়ে আলোর পলতে বাড়িয়ে দিতে গেল। সনাতন মাথা নেড়ে নিম্নকণ্ঠে নিষেধ করল—'হেই! চোর হলে সজাগ হয়ে যাবে। থাক।'

সনাতন তাকে থামিয়ে মাজার কাপড় জোরে বাঁধল। ফতুয়ার হাতা গুটিয়ে তুলল আরও ছোট করে। শেষে এগোতে গিয়ে কাছায় প্রবল টান খেয়ে ফিরে দেখল—লোচন বজ্রমুষ্টিতে কোণা ধরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছে।

'তবে সঙ্গে আয়।' সনাতন বিরক্তিভরে ফিসফিস করল।

লোচন নিমেষে হাতের মুঠি ছেড়ে দিয়ে মুখ গুঁজে বসে পড়ল।

'সেই ভাল, বসে বসে রাম-নাম কর।'

এ-কথায় মুহ্যমান লোচন একবার মুখ তুলে চেয়েছিল, তারপর সনাতনকে আঁকড়ে ধরে সেই-যে উঠে দাঁড়াল আর সঙ্গ ছাড়ল না।

দু'জন নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল। শব্দ স্টুডিয়োতেই বটে। ঘরের দরজা খোলা, আঁধার বারান্দায় চৌকাঠের আকার হয়ে চৌকো খানিকটা আলোও পড়েছে। সেটাকে সযত্নে এড়িয়ে দু'জনে কপাটের পাশ থেকে অসম-সাহসে উঁকি মারল—যা দেখতে পেল তাতে উভয়েই চমকে উঠে বোবা হয়ে গেল: গভীর নিশুতি রাতে সেই হলঘর—সে যেন এক স্তব্ধ গোপন-লোক। এক কোণে বড় একটা মোম জ্বলছে বাতিদানে। তার অস্পষ্ট আলোয় ঘরময় সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ঘোড়া

ঝুলো কবন্ধ মূর্তিরাশির সে যেন এক নিঃশব্দ নিশীথ-সভা বসে গেছে। অন্ধ-মূক-বধিরদের সভা। তারা কি বলতে চায় তা বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু সবারই দৃষ্টি যেন মাষ্টারমশায়ের মূর্তির উপর নিবদ্ধ—অন্তত, সেটা বড় বলে তেমনই দেখাচ্ছে।

এতেও সনাতন-লোচন নির্বাক হোত না। কিন্তু বিস্ময় যে সেই মূর্তির দিকে অপলক চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর—তাদের দাদাবাবু। সে হেলছে না, নড়ছে না। ওই জড়দের সভায় সে-ই একমাত্র প্রাণী, কিন্তু কি যেন গভীর সমস্যায় সেও একেবারে মূর্তি হয়ে আছে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোচন। কিন্তু সেই শব্দে চমকে উঠে ভাস্কর চারদিকে এমন করে তাকাতে লাগল যেন সে গভীর রাতে তার নিজের ঘরেই চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে।

সনাতন লোচনকে টিপে দিল, টেনে নিয়ে দূরেও সরে গেল। লোচন চুপিচুপি বলল—'যেমন ভাত দেবার তাড়া থাকলে রাতে উঠে রান্নাঘরে যাই—এও তেমনি।'

'চুপ। সনাতন ইশারা করল—'তোর খুন্তি দিয়ে পৃথিবী মাপতে চাস!'

'যা চোখে দেখলাম তাই তো বলব।'

'যা চোখে দেখলাম—চোখে! সাধে লোচন তুই! এখন থাম।'

উভয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল, ভাস্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে মূর্তিটাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে—যেমন ঢাকা থাকে। দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল কবার, তারপর পূর্বের মতো পা টিপেটিপে নিঃশব্দে ফিরে এল। কিন্তু সেই অন্ধকারে স্তিমিত আলোয় যে-দৃশ্য দেখে এল সেটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে গেল—চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বিভীষিকার মতো।

লোচন ফিরে এসে আবার শোবার আয়োজন হিসাবে দুয়ার আটকে

দিল, খিল আটকে দিল, আলোটাকে বাড়াবে কিনা ভেবে শেষে বাড়িয়েই দিল সেটা। তারপর বিকল চিত্তে কাঁথায় পড়ল শুয়ে—সে যেন বিস্ময়ের ধাক্কায় ফতুর হয়ে গিয়েছিল।

সনাতন শুতে পারলী না। মাদুরে বসে হাতে-ঘেরা জোড়া-হাঁটুর পর মাথা রেখে সেটাকে নানা প্রকারে খেলাতে চাইল। মনের মধ্যে স্বল্পালোকে আলোকিত সেই নীরব দৃশ্য, তার চারপাশেই কুহেলীর মতো কালো আঁধার। সে ভাবতে চাইল—এর অর্থ কি? ভাস্করের এ-আচরণের অর্থ কি? কিন্তু ইদানীং ভাস্করের নিজের চেয়েই কি আশ্চর্য কিছু আছে!

সে পুরানো লোক, কিন্তু অধুনা ভাস্করের সবই দেখছিল নতুন। তার চোয়ালের হাড় ক্রমেই বেরিয়ে আসছে, অথচ ঘরে যারা পূর্বে অস্পৃশ্য ছিল সেই ব্রাশ-চিরুনি-পাউডারদের প্রবেশাধিকার নিত্য-নতুন বেড়ে যাচ্ছে। হরেক প্রস্তু পোষাক, হেঁটে গেলে পাশ থেকে খোশবো পাওয়া যায়—এ সমস্তই মেয়েদের মতো। অথচ দিন দিন শরীরও কিনা ভেঙে যাচ্ছে। মাঝে অবশ্য দু'দিন তার পাঁজর ফুলে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে গেছে; কিন্তু তাকেই কি এ-সকলের কারণ বলা চলে!

মমতার সঙ্গেই বা কি হয়ে গেল? সনাতন ভাবতে চাইল—সেই বা আসে না কতদিন? এমন সময় ভাস্করের শোবার ঘরের জানলা খোলার শব্দ কানে এল। বৃদ্ধ মনে মনে বুঝল—এখন সুরু হবে জেগে থাকার পালা। মাঝখানের দেয়াল ঘুচে গিয়ে তার ওপাশের জানলার ধারের স্তব্ধ মূর্তিটিকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল—সাদা দেয়ালের পটে একটা নিস্পন্দ কালো মূর্তি সারা-রাত জেগে বসে আছে।

সহসা আঁধার বিছানায় লোচন একটু নড়ে-চড়ে নিঃশ্বাস ফেলল—'এ জীবনে সুখ কারো নেই।'

মহা দার্শনিক ব্যাপার! মনে হোল সিদ্ধান্তটা বাগে আনতে সে এতক্ষণ অনেক ভাবনাই ব্যয় করেছে।

আঁধারে সনাতনের কাছ থেকে জবাব এল না।

কিন্তু যে-আগ্রহ লোচনকেও দার্শনিক করেছিল তা একটা মন্তব্য করে নিবৃত্ত হোল না। লোচন কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আবার ডাকল—'সোনা-দা!'

সনাতন অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'হুঁ।'

'দাদাবাবুর টাকা আছে জানি। কিন্তু এমন কি কেউ নেই —ধরো জ্যাঠা কিংবা কাকা—যারা এই বয়সকালে ডাগর দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়?'

সনাতন বিস্মিত হোল। কিন্তু অন্ধকারেও লোচনের ভাবনার ধারা অস্পষ্ট রইল না। বলল—'উহুঁ, না।'

'তাইতে-ই। আমার তারা মেলা আছে, কিন্তু টাকা নেই।' বলে লোচন আবার নিঃশ্বাস ফেলে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে নিল। বলল —'মন তাই ভোমরার মতো উড়ে উড়ে বেড়ায়।'

সনাতন কি জবাব দেবে এর!

পরের দিন বেশ বেলাতেও ভাস্করের ঘরে ঢুকলে সনাতন আশ্চর্য হোল—ভাস্করের পিঠের তলা থেকে বিছানা যেন ক্রমেই খসছে। আজও সে কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো আরাম-কেদারায় পড়ে। মাথার নীচে কেদারা ঢেকে কালো একখানা শাল—এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। সে যেন সারা-রাত সেই পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ভাবনার সঙ্গে যুঝে ধরাশায়ী হতে হতেও কেদারায় মাথা রেখে স্থির হয়ে আছে।

সনাতনের পায়ের শব্দে সে জড়-আলস্যে চোখ মেলে তাকাল, গুরুতর আহত ব্যক্তি যেমন বোধহীন চোখে তাকায়। সনাতন

চেয়েই আছে দেখে ভাস্কর কুণ্ঠিত একটু হাসল, বলল—'রাতে ভাল ঘুম হয়নি, তাই।'

ভাস্কর কি আজ তবে নিজের কাছে জবাবদিহি খুঁজছে!

সনাতন চোখ ফিরিয়ে নিল, জানলাগুলো একে একে খুলতে লাগল। সে কি আর কাল রাতের কাণ্ড জানে না!

'সূর্য কি উঠেছে নাকি রে?'

সনাতন জানলাই খুলতে লাগল।

'জ্বালাতন!'

'সুয্যি কি উঠলেই দেখা যায়—সময়ে কুয়াশাতেও ঢাকা থাকে না!' সনাতনের কথাগুলি বাঁকা, কিছুটা যেন অভিমানের মতো।

ভাস্কর তার অভিমানের কারণ বুঝেছিল—সনাতন লালকুঠিতে যাওয়া-আসা সইতে পারে না। বলল—'নাঃ, সন্ধ্যায় বেড়াতে যাওয় ছেড়ে দেব। রাত হয়, ঘুম হয় না—শরীরও ভাঙছে, কি বলিস?'

'আমি কেবল জ্বালাতন বইতো নয়।'

'তা হোক। পুরনোর মধ্যে আছিস তবু তুই—তুই আমায় কোলে করে মানুষও করেছিলি।'

কিন্তু সনাতন যেন এ-সব কথা শুনতে পেল না। সে জানলাগুলো খোলা হয়ে গেলে শালখানা গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল—'ভাতই খে হবে? লোচনকে তাই বলে দি?'

ভাস্কর ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভী পায়ে চলে গেল।

ভাস্করও নিজের অনতিপূর্বের উক্তি নিয়ে অন্তরে একটু বিম হয়েছিল। 'সন্ধ্যায় বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দেব—' তাই দেবে নাকি একথাও সে না ভেবে পারল না যে, অনেক রাতের মতো কালও ভু'জা

লালকুঠিতে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে ছিল। শুধু তাই নয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্থিরও হয়েছিল—ভাস্কর আজ-কালের মধ্যে এই স্টুডিয়োতে উর্বশীর মূর্তি গড়ায় হাত দেবে, আর আদর্শ দেবে কৃষ্ণা। মূল্য-বোধ ছিল না এমন নয়। প্রথম কালই সে গভীর রাতে উষানাথের মূর্তির কাছ থেকে ছুটি নিতে পেরেছিল। এমন অবস্থায় এখন কোথাও না যাওয়া কিংবা কিছু ছেড়ে দেওয়া একটা শোনাবার মতো সংকল্পই বটে। ভাস্কর মনে মনে হাসল—কিছুদিনের মধ্যে এই স্টুডিয়োর চারকোণে যেসব মূর্তিগুলো থাকবে তাদের কি সে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে না?

সনাতন চা নিয়ে আবার এল। তেমনই গম্ভীর কণ্ঠে বলতে বলতে এল—'আর খাওয়াও হয়েছে এক। নিত্যি নুনে কিংবা আলুনী—সেই ডাল ভাজি ঘণ্ট।'

ভাস্কর আপন ভাবনায় মগ্ন হয়ে ছিল, উত্তর দিল না।

সনাতন কিন্তু ভাস্করের স্মিত-মনের খোঁজ অনতিপূর্বে জেনে গিয়েছিল। তাই চায়ের কাপ সামনে দিয়ে ঈষৎ লঘু কণ্ঠে আবার বলল—'আমরা হলাম পাচক-ভৃত্য। কেউ মাঝে মাঝে না দেখিয়ে দিলে রান্নার কাজ কি আমাদের দিয়ে হয়—না তাই দেহে কারও সয়। কাদার কম্ম গোলাপের সার হওয়া!'

ভাস্কর কথা বলছে না।

সনাতন বলল—'ভোজের তারিখ গেছে কি সেই আজ। কমাস হয়ে গেল। সে তো রান্না ছিল না—অমিবৃতো।'

সনাতন কার কথা তুলতে চায় বুঝতে পেরে ভাস্কর চকিত হয়ে তাকাল, তারপর পেয়ালা নিয়ে আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিল।

সনাতন ধীরে ধীরে পেশ করতে থাকে—'আশ্রমের দারোয়ানের

সঙ্গে পরশু হঠাৎ দেখা। শুনলাম শরীর ভাল নয়, মাসখানেকের ছুটিও নিয়েছেন।'

ভাস্কর বিস্বাদ কণ্ঠে বলল—'সনাতন, মাইনে কি তোদের এই জন্যে দি? তোদের কি নিজের কাজ নেই?'

'আছে না!' বৃদ্ধ যেন ব্যাপারখানা বুঝল। বলল—'নিজের না হলে কি তার জন্যে কেউ এমনধারা ভাবনা-চিন্তা করে। এখন তো শোনাই যাচ্ছে, কঠিন অসুখ হয়েছিল। তাই একবার গিয়ে কোন রকমে চোখের নজর দেখেই চলে আসা।'

ভাস্কর চমকে বলল—'দেখে আসা! কাকে? তুই কি সেখানে যাবি নাকি?'

সনাতন মৌন হয়ে থাকল, তার মানে দুর্বোধ্য নয়।

'বেশ।' ভাস্কর বলল—'তাহলে সেখানেই তুমি থেক। এখানে আর ফেরবার দরকার নেই। বুঝলে!'

সনাতন বিনীত ভাব ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন তাতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু এই অনুশাসনের স-রস অভ্যন্তরও সে স্বচ্ছ দেখতে পেল। বস্তুতঃ লোচনের গতরাত্রের অস্পষ্ট উক্তি শোনার পর থেকে সে ভেবে ভেবে অনেক কিছুই স্বচ্ছ করে নিয়েছিল।

দুপুরে খেতে বসলে সনাতনের প্রখর রুচিবোধ এবং কঠোর তাড়না লোচনকে আজ প্রতি-গ্রাসে শঙ্কিত করে তুলল—এটা হয়নি, ওটা হবার জো ছিল না, এমন ভাবে আর চলবে না।

শেষে সে একপ্রকার না খেয়ে যখন খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল, লোচন মুখ কাঁচুমাচু করল—'আর কটা খেলে না সোনা-দা?'

বৃদ্ধ খেতে ভালবাসত। লোচনের মুখ দেখে হো-হো করে হেসে উঠল—'জায়গা রাখা দরকার যে—এ আর বুঝলিনে?'

লোচন বিস্মিত হোল।

'খুকি এলে রাতের খাওয়া তো যে-সে হবে না!'

সনাতন স্থিরই করেছিল, দুজনকে যে-করে হোক মিলিয়ে দিয়ে তবে শান্ত হবে।

১৩

রৌদ্রের তেজ পড়ে এলে সনাতন মমতাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হোল। এ-বাড়ির সবই তার চেনা, মমতাকে আগে আগে পৌঁছে দিয়ে যেত। মমতার অসুখ-সংবাদকে ওবেলায় গুরুত্ব না দিলেও এখন সে মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল—জানে না কি দেখবে, কেমন আছে স। এমন সময় মমতাই বাইরে আসছে দেখে সে ত্বরিত পায়ে সামনে গিয়ে ডেকে উঠল—'খুকি—দিদিমুণি!'

প্রথম ডাকটা শুধরে নিয়েই দ্বিতীয় ডাক দিল—মমতা একা ছিল না। অপর দু'জনকে সে চিনতে পারল না, উদয় ও মালতীকে সনাতন পূর্বে দেখেনি। সবারই গায়ে বাইরে যাবার সাজ।

মমতা বিস্মিত হয়ে গেল।

সনাতন এগিয়ে বলল—'দেখছ কি! আর রাগ নেই, চলো।'

মমতা সঙ্গীদের দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে নিস্পৃহ স্বরে বলল—'রাগ! কার?'

'আবার কার! আচ্ছা বেশ, নাহয় না হোল রাগ—তোমার বেশী তা আমি জানিনে। চলো।'

মমতা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বলল—'সে হয় না সনাতন, তুমি যাও।'

'কি বললে ?' অপ্রত্যাশিত উত্তর যেন মাথায় ঢুকল না।

উদয় মালতীকে নিয়ে অদূরে অপেক্ষা করতে থাকলেও ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। হেসে বলল—'বিড়ম্বনা কি কম! আমরা বুঝি ডাক যখন আসে তখন যেতেই হয়, কি বলো হে ?'

মমতার কান লাল হয়ে উঠল। কিন্তু উদয় ইদানীং সুযোগ পেয়ে আচরণের পরিধি ক্রমে বাড়িয়ে নিচ্ছিল। সনাতন একবার প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল, কিন্তু মমতাকেই মিনতি করল—'দিদিমণি !'

'উঁহু, সে হয় না সনাতন।'

এবার সত্যই চপল বালকের গণ্ডে কেউ যেন চড় মেরে দিল। সনাতন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে ক্ষুব্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল.—'তবে আর কি হবে।' সে পিছন ফিরে রওনা হয়ে এল।

মমতা এসে সঙ্গ নিল, বৃদ্ধকে সে গভীরভাবে ভালবাসত। বলল—'আর ভেবে দেখ, যদি কোন ভাগেরই ব্যাপার হয়—তো সেকি এমন সর্ত করে হয় যে একজনের রাগ না থাকলে আর একজনেরও ক্ষোভ চলে যাবে ?'

সনাতন তার মুখের দিকে চেয়ে একটু দাঁড়াল, কিন্তু জবাব দিল না।

'তোমার দাদাবাবু জিজ্ঞাসা করলে তাঁকেই বলে দেখ।'

'কিন্তু তিনি তো এসব জিজ্ঞাসা করবেন না।'

মমতা কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে যেন দমন করে নিল, বলল—'না করলেও এই তো তাঁর মনের কথা ?'

'না।' সনাতন ম্লান একটু হাসল—'তুমি বলছ মনের কথা। কিন্তু দু-দুবার অসুখে পড়ে বেঁচে উঠলেন—তাই কি তাঁর মনের কথা জানতে পেরেছি।'

'অসুখ করেছিল ?'

সনাতন চলতে লাগল—'সে তো তোমার শুনে দরকার নেই।'

'বুড়ো!'

'ওঁরা আবার দাঁড়িয়ে আছেন, দেরি হচ্ছে তোমার।'

'তা হোক, তুমি বলো।' মমতা ঘনিয়ে এল।

সনাতন যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়াল। বলল—'অসুখই করেছিল। কিন্তু আমি ভাবছি, শুধু অসুখ বললে তার কতটুকু বলা হয়।'

মমতা উৎসুখ অসহিষ্ণু চোখে চেয়ে আছে।

সনাতন বলল—'আচ্ছা আচ্ছা—শোন। সেই যে শেকল না কি ভেঙেছিলেন—তুমিই ভাল জান, সবাইকে ভোজ দিয়েছিলে আনন্দ করে—তার পর থেকেই ঘাড়-পাষড় মাঝে মাঝে ফুলে উঠতে থাকে।'

মমতা ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

'জানতে তাহলে! আমরা জানতাম না। দু'দিন সেটাই বেড়ে উঠে নাক দিয়ে সড়সড় করে তাজা রক্ত অনেক পড়ে গেল। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান।' বলে সনাতন একটু থেমে থাকল। শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলল—'আমরা কি আর ভাল আছি খুকি, ভাল নেই। তবু ঠাকুর চাকর যতদূর পারি করি।'

'আমাকে ডাকলে না কেন সনাতন?'

সনাতন ঘাড় নাড়ল—'সেকি কাউকে ডাকবার সময় দিয়ে আসে! আর, ডাকলেও তো যেতে পারতে না তুমি।'

কিন্তু সনাতনের খোঁচা মমতা গায়ে মাখল না, বলল—'এখন কেমন আছেন সনাতন?'

'ভাল নয়।' তার দুঃখকে উতলা করে দিয়ে সনাতন গম্ভীর স্বরে বলল—'খুকি, মোটে তো দুদিন হল কিন্তু তাতেই চেহারা এমন হয়ে গেছে যে, দেখলে তোমার চিনতে কষ্ট হবে। সে শক্তি নেই, সে

বই নেই, সে হাসি নেই। যেন সে মানুষই নয়!' বলে বোধহয় তার ভাইয়ের ভগ্ন চেহারাই মনে পড়েছিল, সহসা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—'সর্বনাশের ব্যাপার যে এমনি করেই ঘনিয়ে আসে, খুকি! এখনো বোধহয় বন্ধ হতে পারে, চিকিৎসা হতে পারে, সব পারে—কেবল তুমি যদি যাও। যদি আজই চলো!' বলে সে উৎসুক চোখে মমতার দিকে তাকাল।

মমতারও চোখ ফেটে জল আসছিল, বলল—'কিন্তু আমি তো কোন কাজেই লাগিনে, ডাক্তার-বদ্যিও নয়।'

'ডাক্তার-বদ্যি! তারা কবে ছিল? কোনদিনই নয়। ত্রিসংসারে ছিলে শুধু তুমি, আর তোমার এই বুড়ো। কোনদিনও কাঁটার আঁচড় লাগেনি তার গায়ে। কিন্তু—কিন্তু—' বৃদ্ধ সহসা আর্দ্র চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিল, বলল—'কিন্তু তুমি যেন সেসব কথা ভুলে গেছ, কিছুই মনে নেই। তবে আর কোথায় তাকাব?'

মমতা মুখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকল।

অধৈর্য মুহূর্ত যায়। উদয় অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে মালতীকে নিয়ে এগিয়ে আসছে, সনাতন ব্যস্ত হয়ে ডাকল—'দিদিমণি!'

মমতা নিজেকে সংবরণ করে নিল! মাথা নাড়ল—'না সনাতন গিয়ে ডাক্তার-কবরেজ দেখাও, ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন বৈকি।' বলেই সে ফিরতে গেলে সনাতন ভয় পেয়ে গেল।

কেন জানে না, বৃদ্ধ আবার মনে মনে আশা করতে সুরু করেছিল। একমুহূর্ত চেয়ে থেকে সেও এবার চোখ নামিয়ে নিল, বলল—'ভাল হলেই ভাল।' তারপর নিকটস্থ উদয়ের দিকে বার বার করে চেয়ে সে কি বুঝল সেই জানে, নিমেষে তার সারা মুখ কালো হয়ে গেল। বলে

উঠল—'তাই। যেতে আর তুমি পার না। কিন্তু দাদাবাবু ঠিকই বুঝেছিলেন, কেবল আমিই জানতাম না।'

'বেশ তাঁকে গিয়ে তাই ব'লো।' মমতা ফিরে চাইল না।

সনাতন মাথা নাড়ল—'না। কোলে করে মানুষই করি আর যা-ই করি, সে মনিব। এই কথা কি আমি তাকে বলতে পারি।'

'কোন কথা?' মমতা চমকে তাকাল।

সনাতন উদয়ের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল, তার দিকে একবার তীব্র-চোখে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। কোন জবাব দিল না।

নিমেষে মমতার মুখ পাংশু হয়ে গেল। কিন্তু উদয় তখন অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আর কিছু বলতেও পারল না।

অল্পক্ষণ পরে সনাতনের চোখের সামনে তিনজন যখন গাড়িতে উঠে বসল, সনাতন আশ্চর্য হয়ে গেল। আসবার সময় মনের আবেগে গাড়িখানাও তার নজরে পড়েনি। ওরে বুড়ো, সংসারে কি এমনি করেই অন্ধ হতে আছে!

গাড়ি কিছুক্ষণ চলবার পরে উদয় ঠিক কাকে বলল বোঝা গেল না, কিন্তু বেশ শব্দ করেই শুনিয়ে বলল—'দিদিশাশুনি চলো! হ্যাঁ, নগদ-বিদায় হাতে নিয়ে ফিরতে হোল বটে।' সনাতনের ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ায় সে মনে মনে যার পর নেই খুশী হয়েছিল।

মমতা ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করল—'যা চেয়েছিলেন তাই কি করিনি?'

'তা—তা বটে।'

'তবে থামুন। আমার কারও প্রশংসার দরকার নেই।' বলে সে আবার জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল—কোনমতেই আর সহযাত্রীদের দিকে চাইতে পারল না।

'মমতা সেই যে একদিন বলেছিল 'কিছুই হয়নি তো'. তা শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হয়নি। প্রতিদিন প্রতিকাজে ব্যবহারকে অম্লান রেখে তার প্রমাণ দিতেও চেয়েছিল। উদয়ও দাঁড়াতে পেয়ে বসেছিল এবং নিত্য-নতুন প্রস্তাব এনে সুবিধায় পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছিল। আজ কিছুপূর্বে কাথ থেকে ফিরে এসে মমতা দেখল—পথে গাড়ি দাঁড়িয়ে। ঘরে পৌছলে উদয় বলল—'আপনি কিন্তু আপত্তি করতে পারবেন না—করবেনও জানি, করলেও শুনছিনে। চলুন।

'কোথায় ?'

তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে উদয় বলল—'ভাল জায়গাতেই তাছাড়া ভ্রমণ-যোগ আপনার শরীরের পক্ষে জরুরী, স্বীকার করেছেন।'

মমতা জিজ্ঞাসুমুখে চেয়ে রইল।

'সিনেমার টিকিট গছিয়ে গেছে—চ্যারিটি শো, বক্সই নিতে হোল'

'আমি তো যেতে পারব না। মায়ের শরীর খারাপ—তাঁকে সাহায্য করতে হবে।'

উদয় তখন ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে মিটমিটি হাসতে লাগ ভুবনবাবুও হাসতে লাগলেন। বললেন—'সেকি আর ও জানে ভেবেছিস! আজ সন্ধ্যায় ওর ওখানে নেমন্তন্ন সবার। বসুমতীকে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যেতে হয়েছে—দেখাশুনো করে দিতে।'

মমতা অস্ফুটে বলল—'দেখাশুনো করে দিতে!'

উদয় হেসে বলল—'হ্যাঁ, তাই। অবশ্য সুস্থ তিনি ন'ন। ছেলেদের আবার হয়ে না রেখে পারেন না।'

মমতা তবুও অস্ফুটস্বরেই বলল—'মা রাজি নেই!'

'কেউ গেলে আর কি করে থাকেন।' উদয় বলল—'কিন্তু আপনি কি দুঃখিত হচ্ছেন?'

মমতা স্তব্ধ হয়ে থাকল। মাকে কেমন চক্রান্তে পড়ে নড়তে হয়েছে, তা সে আজকাল নিজেকে দিয়ে বোঝে।

তার মনের অবস্থা বুঝে উদয় ভিতরে ভিতরে হাসছিল। কিন্তু মুখে গভীর উদ্বেগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তাহলে যাবেন তো?'

মমতা নিজেকে সংবরণ করে নিল, বলল—'যাব বৈকি।'

'বেশ বেশ, কিন্তু আর একটা অনুরোধ। গাড়ি আমাদের পৌঁছে দিয়ে তবে মামাকে নিয়ে যাবে। রওনা হতে দেরি না হয়।'

'তাই হবে।'

উদয় আর আড়ালে সরতে একমুহূর্ত দেরি করল না। ভুবনবাবুও অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়লেন।

মমতা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষোভে দুঃখে ভাবতে চাইল—এমন হয় না যে নিজেকে নিঃশেষ করে বাতাসের মধ্যে মুছে ফেলা যায়, কোন চিহ্নই আর বাকী থাকে না? সে দিনের পর দিন এ কোথায় ছুটেছে—কিসের আশায়? তারই কথার সূত্র যে এতদিন শতগ্রন্থি জাল হয়ে এমন করে তাকে বাঁধবে, এ সে কল্পনা করেনি। সে কি এতই স্বাধীন যে যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে, সে কি দুদিনের মতান্তর নিয়ে ভাস্করের সঙ্গে কপটাচরণ করতে যাচ্ছে না—মমতা নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

সময় নিকট হচ্ছিল, এবং অনতিপরেই রাস্তাময় উৎসুক দৃষ্টির সামনে দিয়ে এক গাড়িতে একই আসনে বসে যার সঙ্গে তার নিমন্ত্রণে যাবার কথা—তাকে ভেবে বিতৃষ্ণা ও গ্লানির আর সীমা থাকল না।

'বাড়ি আছিস, মমতা?' মালতী এসেছিল।

মালতী বাল্যসখী। পশ্চিমে যেখানে মাস্টারি করে, উদয়ের পশ্চিমের বাড়িও সেই শহরে। সে ঘটনাচক্রে এখানে এসে ক'দিন ঘনঘন আসা-যাওয়া করছিল। মমতা মালতীকে ধরে বসল—'একটা উপকার করতে হবে।'

'বেশ। দিলাম বর।' মালতী বলল।

'টকিতে যেতে হবে।'

মালতী হেসে উঠল—'মোহংই বন্ধু, এরপর যেন চর্ব্য-চূষ্য খেতে ব'লো না।'

'ঠিক তাই, খেতেও হবে।' মমতা হাসল না।

মালতী বিস্মিত হোল—'হেতু?'

'কিছু নেই। চলো।'

'সেকি! এই বেশেই—কি হয়েছে ভাই?'

'কিছুই হয়নি তো।' মমতা বলল—'দাঁড়াও একটু, আসছি।' সে কথান্তর যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায়।

অতএব সাজও করতে হোল। কিন্তু এই গভীর দুঃখের মধ্যে সে আজ বারংবার শপথ নিয়েছিল—আর নয়, আর একদিনও নয়, এ বিড়ম্বনার শেষ করতেই হবে। ছুটি ফুরোবার আরও কয়েকদিন বাকী ছিল, তবু সে স্থির করেছিল কাল থেকেই বেরিয়ে পড়বে আশ্রমে—স্টুডিয়োতেও যাবে।

এরই পরে সনাতন এসে উপস্থিত হোল, অপ্রত্যাশিত ভাবে। অবস্থাবিশেষের কুণ্ঠা অনেকে কাটাতে পারে না, সেও পারল না। সে শুধু তাকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিয়েছে তাই নয়, সনাতন যে যাবার সময় হঠাৎ কোন ধারণা নিয়ে গেল তাও সে নিজের চোখেই দেখেছিল। ছি-ছি, সনাতন ওকথা ভাবতে পারল! আর, সর্বোপরে ভাস্করের

সেই সুস্থতার সংবাদ ? মমতা বিকালের সংকল্প স্মরণ করে আবার মনে মনে শপথ নিতে লাগল—আর নয়, আর একদিনও নয়।

গাড়ি আপন বেগে ছুটে চলছিল। চোখের উপর থেকে একে একে সরে যাচ্ছিল গলির মোড়, পথিক, সারি সারি দোকান। কিন্তু কিছুই তার মনের মধ্যে প্রবেশ করল না।

মালতী ডাকল—'বাঃ রে, এদিকে ফেরো !'

উদয় মালতীকে নিরস্ত করল—'থাক না।'

'থাক না ! না, তা হবে কেন !' মালতী বলল—'তাছাড়া সবাই মিলে পশ্চিমে যাবার যে-প্রস্তাব কাল উঠেছিল, সেওতো কাল শেষ হয়নি। এখন—'

'কারও যদি জরুরী কথা ভাববার থাকে, কাজ কি বাধা দিয়ে ?'

মালতী সকল তাৎপর্য বোঝবার মতো পুরানো হয়নি। তাই বিস্ময়ে বলল—'কিন্তু কথাতো ও বলেই এল, দেখে এলাম !'

'সেটা ভ্রাতার সঙ্গে, সদরে। কিন্তু অন্তরে মনিবের সঙ্গে যেটা চলছে, আমি বলি কি, তাতেও আমরা নাই-বা বাধা দিলাম ?'

মমতা হঠাৎ ঘুরে বসে সজল চোখে বলে উঠল—'হয় অপনারা থামুন, না হয় বলুন—আমি নেমে যাই।'

মালতী বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু উদয় অপ্রতিভ হয়েও হাসতে লাগল—'নেমে যাই। পথের মধ্যেই যাবেন—হেঁ-হে-হে—কিন্তু পথেরও যে অল্পই আর বাকী। সিদ্দিক !'

'জী হুজুর।' চালক সাড়া দিলে গাড়িখানা একটা ঝাঁকানি দিয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগল।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে সেটার গুঁড়ো হয়ে যাবার কথা, কিন্তু সনাতনের মাথা খানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'আদর্শ' দেবার প্রথম দিন বলে কৃষ্ণা এসে অল্প পরেই বিদায় নিয়েছিল, এবং ভাস্কর দীর্ঘ বারান্দা থেকে থেকে পায়চারি করে ফিরছিল—সনাতনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা।

ভাস্কর কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল—'খাওয়াটা তাহলে কোথায় হয়েছিল, শুনতে পাইনে?'

সনাতনের মুখে কথা নেই, মাথা আরও নুয়ে পড়ল।

'বলবে না! তাহলে লোচন হয়তো বলতে পারবে। তাকেই ডাকি।' বলে ভাস্কর কয়েক পা গিয়ে বলল—'কিন্তু তাতে আবার মান যাবে না তো তোমার?'

সনাতন আনতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

'লোচন!'

সনাতন কুণ্ঠিত হয়ে বলল—'নাহয় আমিই বলছি।' তবু বলতে গিয়ে তার দেরি হতে লাগল।

'তোমার যদি কষ্ট হয়, থাক না। লোচন তো আছে।'

'দিদিমণির ওখানে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?' ভাস্কর ভ্রূকুটি করলেও একথা সে আগেই বুঝেছিল। তার গম্ভীরস্বরে ঔৎসুক্যও লুকোন থাকল না।

সনাতন বলতে গিয়ে মুখ তুললে ভাস্করের চোখে চোখ পড়ায় আবার মুখ নামিয়ে নিল।

ভাস্কর যেন হাসল, বলল—'কোথা থেকে সুরু করবে বুঝতে পারছ না? এতদিন পরে দেখা হলে দুজনে যে খুব গল্প-সল্প হোল, খাওয়া-দাওয়াও হোল—সে আমি না বললেও বুঝে নিতে পারি। তা নয়,

আসল কথাটা হোল কি—ভিতরে ভিতরে দেবী আর ভক্তের কি পরামর্শ হয়নি?'

'পরামর্শ হয়নি, তার আসা হবে না।'

'কার?'

'সে নাম আমায় নিতে ব'লো না।'

'যাঃ, লুকোচ্ছিস!' কঠোর দেখাবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভাস্করের মুখ মলিন হয়ে এল।

সনাতন ঘাড় নেড়ে বলল—'না, লুকোব কেন! তাছাড়া আমি তো একাই নয়, সেখানে আরও লোক ছিলেন।'

ভাস্কর শুষ্কমুখে চেয়ে রইল। সনাতন বলল—'একজন তারই বয়সী হবেন, মেয়ে। আর একজন—হবেন কোন বড়লোকের ছেলে কিংবা কিছু!'

'উদয়বাবু?'

'হতেও পারেন। সবাই সাজগোজ করে গাড়িতে কোথায় গেলেন।'

ভাস্কর তবু কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'দুজনেই তাহলে ছিলেন, কি বলিস। বললেনও বোধহয় দুজনেই?'

সনাতন চুপ করল, বোধহয় বিবেচনা করে দেখতে যে—অপরিচিতের সেই অপভাষণ 'বলা'র মধ্যে পড়ে কিনা। কিন্তু ভাস্কর তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সহসা অট্টহাসি জুড়ে দিল এবং কিছুক্ষণ ধরে থেমে থেমে থেকে থেকে তেমন ভাবেই হাসতে লাগল। শেষে গম্ভীরও হোল হঠাৎ। মুখখানা কঠোর করে যেন ধমকে উঠল—'বেশ হয়েছে। এ-শিক্ষার তোমার প্রয়োজন ছিল। মুখ্যু!'

সনাতন মুখ নত করে দাঁড়িয়ে রইল। সে একদিন কিনা খুকির পরে অনেক আশাই করেছিল!

ভাস্কর শাসিয়ে বলল—'কাল থেকে কোথাও যদি গেছ, তুমি আর নেই। মনে রেখ।'

বৃদ্ধ আপত্তি করল না।

'কাজের সময় দেখতেই পেলাম না। এমন একটা মানুষ নেই যে আটটুকুও এগিয়ে দেবে! কি সব সুহৃদ! তাছাড়া, কাল থেকে যখন কাজে থাকব সিঁড়িয়োর বাইরেও কারো থাকা দরকার—বুঝলেন!'

ভাস্করের কথাবার্তা ইদানীং কর্কশ হয়ে উঠছে। কিন্তু বৃদ্ধ সবই মেনে নিল। আর তার নিজের বুদ্ধিতে বুঝে চলবার বিন্দুমাত্র শখ ছিল না। দিনকাল সব কেমন যেন আবছা হয়ে আসছে—এ-চোখ দিয়ে আর কতদিন চলে! না'হলে কিনা তাঁদের খুকি—তাদের দিদিমণি—বৃদ্ধ একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস চেপে ফেলল।

১৪

বিধাতার প্রভাতের মধ্যে ভুবনবাবু সুখেই জেগেছিলেন, কিন্তু চোখ মেলার পর থেকে মনে সুখ ছিল না। তাঁর রাগ দেখাবার সব কয়টা পরিচিত লক্ষণ একে একে প্রকাশ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বসুমতী চা এনে দিলে তৎক্ষণাৎ একচুমুক খেয়ে ঠক্ করে পেয়ালা রেখে বসে রইলেন।

দাদার মনের কথা ভগ্নীর অজানা ছিল না। বসুমতী নিঃশব্দে সরে যাচ্ছিলেন, ভুবনবাবু তিক্তকণ্ঠে বললেন—'মমতা কোথায়? সকাল থেকে ব্যাপার চলছে কি?'

'দেখতে পাচ্ছ।'

'দেখছি বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি। তোড়-জোড়টা কিসের?'

'ছুটি ফুরিয়েছে। আশ্রমে যাবে।' বসুমতীর কণ্ঠে মেয়ের জন্য গুপ্ত স্নেহ ছিল। মমতার সহজ হবার কঠিন আচরণ দিন দিন দুর্বোধ্য লাগায় তিনি তার আশ্রমে যাবার সংকল্প শুনে মনে মনে স্বস্তিও পেয়েছিলেন।

কিন্তু ভুবনবাবু তাঁর সায় আছে বুঝে আরও তপ্ত হলেন। বললেন—'আশ্রম! তবে বল গিয়ে পরিশ্রমের কোন দরকার নেই। ছুটি ফুরোলে ছাড়াও সুরু হবে।'

'কেন?'

'আর যাবে না বলে।' ভুবনবাবু পেয়ালা টেনে নিলেন।

'তাতে ওর মত না থাকলেও? এমন করে চললে লোকে কি বলবে, ভেবেছ?'

'বলা-বলি বন্ধ করতেই তো—আর একদিনও দেরি চলবে না।'

বসুমতী বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন। ভুবনবাবু চায়ে আবার চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন—'আর ধর যদি পশ্চিমে যাওয়াই হয়! এখানে রান্নার একটা লোক পাসনে তুই—বাড়িসুদ্ধ অসুখ বলেই তো কথা! তবে কদিনের জন্যে আশ্রমে গিয়ে লাভ? বিকেলে এজন্যে উদয় আসবে, মালতী আসবে।'

একটু থেমে বললেন—'বরঞ্চ, ও আবার ছুটির জন্যে দরখাস্ত করুক। কেমন হয়?'

'জানিনে।'

'জানতেও হবে না।' ভুবনবাবু রেগে উঠলেন—'শুধু সেই কথাটা ওকে গিয়ে জানিয়ে দাওগে। আমায় কৃতার্থ করো।'

কিন্তু বসুমতীর নড়বার বিশেষ তাড়া ছিল না। তিনি পার্শ্ববর্তী মমতার ঘর দেখিয়ে বললেন—'সে নিজেই সব শুনতে পাচ্ছে।'

ভুবনবাবু জ্বলে উঠলেন—'শুনছে? ওঃ, তাবলে কি থেমে থাকব নাকি—ভয় পেতে হবে? যাও না, মেয়েকে একটু শাসন করোই না—ভাল-মন্দও তো সমঝে দিতে পার!'

ক্রমাগত তাড়না শুনে শুনে বসুমতীর চোখ-মুখ আরক্ত হয়ে উঠছিল। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন—'তাই যাচ্ছি।' যা কখনও হয় না—তাঁর বিক্ষুব্ধ পদশব্দ শোনা গেল।

সহসা মমতাও তার নিজের ঘরে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে বসল। মুখভাব কঠিন হয়ে গেল।

আজ সকাল থেকে তার নিভৃত হৃদয়ে মুক্তির একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বইছিল—যে-কথা নিজের হলেও জাল হয়ে প্রতিদিন তাকে পিষে ফেলছিল সেই ফাঁদ সে আপন জোরে ছিঁড়ে এসেছে। আজ সে আশ্রমে যাবে স্টুডিয়োতে যাবে—যেখানে তার মুক্তি। তার সমস্ত কাজ-কর্ম জোগাড়-যন্ত্রের মধ্যেও অনুক্ষণ এই যাবার আয়োজন প্রকাশ পাচ্ছিল। তার পড়বার টেবিলে ভাস্করের একমাত্র উপহার রাখা ছিল—একটা ব্রঞ্জের ধ্যানী-বুদ্ধ। দিয়ে ভাস্কর বলেছিল—'ভারতের আত্মা তোমাকে দিলাম মমতা, হিমালয়ের শুভ্র শিখরটি কি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ না?' আজ সে সকালে উঠে তার গলায় একটা শুক বেলার মালা তুলিয়ে দিয়েছিল। মনে মনে জানত যে-হৃদয় এই মূর্তি গড়েছিল মালার অর্ঘ্য যেন পৌঁছল সেখানে গিয়েও। এখন সেই মাল্য-ভূষিত মূর্তি বা মূর্তিকার কাকে সমুখে করে সে নিজেও জানে না, মমতা নিমেষে আপনাকে সবল করে তুলতে লাগল—আর কান্না নয়, আর বাধা নয়, যে-খাঁচা সে নিজে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে কোন শাসনেই আর তার দিকে ফিরে চাইবে না।

বসুমতী এসে প্রবেশ করলে সে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—'আমায়

বোলো না মা, বোলো না। শুনতে আমি চাইনে! যদি এতই তামাদের—য-দি—' সে মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টির পড়ায় আস্তে আস্তে থেমে গেল।

মা ম্লান হেসে বললেন—'তোকে রাগতে হবে না। সময় হয়ে এল, ছিয়ে নিয়েছিস?'

মমতা দাঁড়িয়ে রইল, গলায় স্বর ফুটল না।

'মিছে ভাবিস নে খুকি। প্রথম দিন, কাগজপত্র ফেলে যাসনে যেন।'

'মা!'

'আরে পাগলি। মা-কি মরে গেছে?'

মমতার চোখে জল, সেটা লুকোতেই সে মুখ নামিয়ে ছুটে বেরিয়ে ল।

অতএব একপ্রকার যথাসময়ে নির্বিঘ্নে মমতা পরিচিত রাস্তা দিয়ে শ্রমমুখো রওনা হয়েছিল। পথ শুধু বন্ধুর মতো চেনা নয়, সে তাদের নেকদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার নীরব সাক্ষী। এই পথেই একদিন র আদর্শ সামনে রেখে দু'জনে চলার সংকল্প গ্রহণ করেছিল, যেন, অনেকদিনের পর মনের শান্তি দেহের আরাম ফিরে পেল।

কিন্তু সে আশ্রমে পৌঁছলে ক্রমে উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়ে উঠল। দিকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির নানা লক্ষণ বিদ্যমান। যারা ঘনিষ্ঠ তারা হলে একপ্রকার ব্যস্ততা দেখিয়ে সরে পড়ছিলেন—যেন কিছু স্থত ভাবে। তার ছুটি ফুরোয়নি, এজন্যে সে কিছুটা অপ্রত্যাশিত। তাহলে এ-সবের কারণ কি শুধু তাই?

সমস্ত আশ্রমের মধ্যে তার কথা হোল একমাত্র ঊর্মিলার সঙ্গে, অল্প ক'টি। পৌঁছবার কিছু পরে সে তাঁতবিভাগে গিয়ে ডাকল মি!'

উর্মিলার তাঁত চালানো বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে কলরব করে উঠে এল না। বলল—'আয়। শরীর তেমন সারেনি দেখছি—আরও তো ছুটি ছিল।'

মমতা এগিয়ে গেল, জবাব দিল না।

'আগেই এলি যে?'

'এ-লাম।' মমতার স্বরও ক্ষুণ্ণ।

উর্মিলা কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল—'সেই তো এলি, যদি আরও কিছুদিন আগে আসতিস।'

'তার মানে?'

'তার মানে কিছু না। আগে বোস। মা কেমন আছেন?'

মমতা দাঁড়িয়ে রইল—'আগে বল, ও-কথা বললি কেন?'

'হয়তো ভাস্করবাবু কাজ ছাড়তেন না, অবশ্য—'

'এ হয় না উর্মি, এ হতে পারে-না!' মমতা বসে বলে উঠল।

'তাহলে জানতিস নে!' মমতার মুখ বিবর্ণ দেখে উর্মিলা বলল—'ও অনুমান আমিও করেছিলাম। বিভাগটাকে নতুন করে গড়া হবে—কোন একজন অজ্ঞাত দাতার অর্থ সাহায্যে।'

মমতা মাথা নাড়ল যে, সে নিজেও তা দেখে এসেছে।

উর্মিলা কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল—'হয়তো ছাড়তেন না। কি যতীবন্ধু নীতি সময়ানুবর্তিতা পুনর্গঠন সব বড় বড় কথা নিয়ে কদি এমন তাল-পাকাতে লাগলেন যে, কথাটা কাঁরও কানে গেল। এ সময় যার আসা-যাওয়া দেখে ঘড়ি মেলান যেত, তাকে কিনা সময়া বর্তিতার উপদেশ! ভদ্রলোক শুনতে লাগলেন আর অন্যমনা মতো ঘাড় দোলাতে লাগলেন। শেষে মুচকি হেসে বললেন—'ব আসব না।'

'আচার্যদেব ?'

'যতীবন্ধু কার্যকরী সমিতিকেই নাড়িয়েছিলেন কিনা।'

'তারপর ?' মমতা রুদ্ধ নিঃশ্বাস চেপে বলল।

ঊর্মিলা ম্লান হেসে বলল—'খুবই সংক্ষিপ্ত। ঢিলে-গোছের লম্বা চেহারাটা অন্যমনস্ক পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে যেন আজও চোখে ভাসে। কেবল ওই সুমুখে এসে একবার যেন ইতস্তত করে দাঁড়ালেন। আমি বেরিয়ে বললাম—মমতা এখনো আসে না, তিনিও আর কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেলেন।'

'আমি যাই।' মমতা উঠে দাঁড়াল।

ঊর্মিলা বিস্মিত হয়ে বলল—'কোথায় ? তাঁর ওখানে নাকি ?'

মমতা জবাব দিল না। কিন্তু দুপুর তখন সবেমাত্র গড়িয়েছে, মমতা স্টুডিয়ো ভেবে বেরিয়ে পড়ল।

•

সে পথখানি যেভাবে এল তা শুধু তার অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু উদ্যানে পৌঁছে পথ যেন আর কাটতে চায় না। পোড়ো উদ্যান, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের অসহ্য গুমটে ছমছম করছে। ইট-সুরকির স্তূপের উপরে ঘাস-আগাছার বিজয় অভিযান অব্যাহত, বিলাতী পামের সারি বুনোগাছের চাপে পড়ে প্রতিদিনই মুণ্ডিত-মুণ্ড, এখানে ঝোপ সেখানে বাদাড়—এর মধ্যে কোথায় ছিল ঠাকুরদালান নাটমন্দির, কোথায় শুনে হাজারখানা পাত পড়ত দুর্গোৎসবে, অতিথিশালা কাছারিবাড়ি তোপখানা—সেসব আর সনাক্ত হয় না। কেবল আশ্চর্য ওই মূর্তিগুলি! উদ্যানের মাঝে মাঝে স্তম্ভের উপর বসান ছিল—কমণ্ডলু হাতে নিয়ে যাজক, অস্ত্র উঁচিয়ে সেপাই, বাদ্যকার। একদিন সকলে মিলে গৃহস্বামীর সমৃদ্ধিই জানাতে বসেছিল এবং প্রাণ নিতান্ত পাথুরে

বলে আজও টিঁকে আছে, কিন্তু কালের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে কেউ ভগ্নপদ, কেউ ভগ্নহস্ত, কেউ লুণ্ঠিতশির। এমতাবস্থায় শুভাকাঙ্ক্ষীরা ত্রিবর্ণ থেকে বিবর্ণ হয়ে বসে।

মমতা যখন উদ্যান পেরিয়ে বারান্দায় এল, তখন পথশ্রমে উৎকণ্ঠায় তার চেহারাও ওদের চেয়ে উজ্জ্বল ছিল না। লড়াই তারও কালের হাওয়ার সাথে—সে মনে মনে ভেবে দেখল। তবু ওদের দেখে নিরস্ত হোল না।

সনাতন স্টুডিয়োর দুয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল। মমতাকে আসতে দেখে নিজের অজ্ঞাতসারে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—'খুকি!' মমতা যে এত শীঘ্র আসতে পারে এ যেন তার স্বপ্নের অতীত ছিল।

মমতা মৃদু হেসে এগিয়ে গেল—'হ্যাঁ, তোমার খুকি। কিন্তু কাল তো আমার পরে রাগ হয়নি, বুড়ো?'

সনাতন কথা বলে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ডাকটা যে অনিচ্ছাকৃত বুঝিয়ে দিতে আবার সে টুলে বসল।

মমতা কাছে এসে সস্নেহে বলল—'চলো। আগে দেখা করে আসি, তারপর পরামর্শ আছে। তখন দেখব রাগ কেমন থাকে।' বলে সে রওনা হতে গেল।

সনাতন এবার চকিত পায়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে চাইল—'ব্যস্ত কি, এত তাড়া কিসের। রোদের থেকে এলে—আগে বসো, একটু জিরোও।'

মমতা বিস্মিত হোল, বলল—'উনি তো স্টুডিয়োতেই আছেন?'

সনাতন অনুযোগ করল—'আর আমরাও যে আছি তা বুঝি দেখলে না—ফিরেও চাইতে নেই! তা হবে না। তোমার ভাঁড়ার তোমার রান্নাঘর তাদের কি দশা হয়েছে, দেখবে চলো।'

'মমতা আর এক পা-ও নড়ল না, বলল—'তুমি কি আমায় স্টুডিয়োতে যেতে দেবে না?'

'আমি চাকর। তুমি গেলে 'না' বলতে পারি?'

'তবে পথ ছাড়।'

সনাতন ম্লানমুখে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'শুনতে কি পাও না?'

সনাতন ক্ষুব্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'একটু দাঁড়াও, মত নিয়ে আসি।'

'মত?'

'হ্যাঁ। আমি চাকর, মনিবের যেমন হুকুম আছে।' একটু থেমে বলল —'না হলে ওর কাজের ব্যাঘাত হয়—সবাই আসা যাওয়া করে—'

'সেকি আমার জন্যেও? এই স্টুডিয়োতে যেতে আমায় মত নিতে হবে? আমাকে কি ভুলে গেলে বুড়ো?' মমতার চোখ যেন ছল্-ছলিয়ে এল।

'ওকে আসতে দাও সনাতন!'

ভাস্করের গম্ভীর কণ্ঠে উভয়ে চমকে দেখল—ভাস্কর উঠে এসেছে, এবং বেরিয়ে এসে ত্বরিত হাতে পিছনের কপাট ভেজিয়ে দিচ্ছে।

মমতা দ্রুত এগিয়ে গেল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—'শুনছেন! সনাতন বলে স্টুডিয়োতে যেতে নাকি আমাকেও মত নিতে হবে—তে, অনুমতি!'

ভাস্কর বলল—'কি চাই তোমার?'

মমতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, বলল—'শিল্পী! ভুল আমার হতে পারে, কিন্তু আপনার চোখ তো ভুল করে না।'

'তুমি এসেছ কেন?'

'আপনিও কি আমার কথার উত্তর দেবেন না ?'

ভাস্কর থেমে থাকল।

মমতার মুখ হেঁট হয়ে গেল। বলল—'সনাতন কাল গিয়েছিল।'

'আমি পাঠাইনি।'

'না হয় পাঠাতেন। এত বড় অসুখ গেল আর সংবাদ পেলাম না আমিই।'

'তুমি তো ডাক্তার-কবরেজ নও।'

মমতা বুঝল, সনাতন বলতে কিছু বাকি রাখেনি। হায় বুড়ো, এমন করে কি সব বলতে হয়! বলল—'তবু তো অসুখ-বিসুখে লোকের দরকার হয়।'

'জানিনে। যাদের কেউ নেই তাদের বুঝি দরকার হয় না।'

'আমি যে ছিলাম!'

'হ্যাঁ, পতন দেখে দূরে সরে ছিলে। কিন্তু আমি কার সাহায্য নিতে যাব, বলো। সে সাহায্য তুমিই বা দিতে আসবে কেন—কার অনুমতি নিয়ে তোমাকে আসতে হোত, ভেবে দেখ।'

'কারও অনুমতি নিয়েই না।' মমতা উত্তরোত্তর বিবর্ণ হয়ে উঠছিল। সজল চোখে হাসতে গেল—'জানেন না বলেই এসব বলতে পারলেন। শুনবেন সমস্ত কথা ?'

'শুনতে চাইনে।'

'কিন্তু আমি যে বলতে চাই।' মমতা বলে উঠল—'দম আমার বন্ধ হয়ে আসে—ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারিনে। দোহাই, আমার কথা রাখুন—কথা শুনুন।'

ভাস্কর মাথা নাড়ল—'না, সময় নেই। বরঞ্চ বলো, তুমি এলে কেন কিসি[illegible] ফিরলে ?'

'কি বললেন ?'

'বলছি যে, যে-প্রয়োজনে এতদিন আটকা ছিলে সেকি ফুরিয়ে গেল—তাই পতিতোদ্ধারে সময় করে এলে ?'

এমন সময় লোচন অনেকদিন পরে গলা শুনতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে বারান্দায় এল—'দিদিমণি !'

মমতার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল, বলল—'বলুন, যতখুশী আমায় বলুন, হয়তো তা-ই আমার পাওনা। তবু এখানে নয়—শুধু ভেতরে চলুন।' বলে স্টুডিয়োর দিকে তাকাল।

ভাস্কর অপলক চোখে চেয়ে রইল।

মমতা বলল—'দাহাই, চলুন।'

'যেতেই হবে, নয় ? তবে দাঁড়াও।' বলে ভাস্কর একটু এগিয়ে গিয়ে সহসা এক ঝটকায় ভেজান কপাট খুলে একেবারে উন্মুক্ত করে দিল। বলল—'চলো।'

কিন্তু নিমেষে প্রচণ্ড আঘাত মাথায় পড়লে আর্ত যেমন 'ওঃ' করে ওঠে, মমতাও তেমন শব্দ করে উঠল। সম্মুখে যেন উদ্যত বিষধর, সে আত্মরক্ষার অস্পষ্ট তাড়নায় অজ্ঞাতসারে পিছনে হঠতে লাগল—চোখের স্থিরদৃষ্টি সুমুখে নিবদ্ধ। তেপয়ার পরে সদ্য আবদ্ধ যে নগ্নপ্রায় নারীমূর্তি অপরিসীম নির্লজ্জ গ্রীবায় দাঁড়িয়ে ছিল সে শুধু মূর্তি বলেই সম্ভব। কিন্তু তার জীবন্ত 'আদর্শ'ও পাশে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণা বিঘ্নপাতে এবং সময় পেয়ে গায়ের উপর একটা আবরণ মাত্র জড়িয়ে নিয়েছিল। সেও বিস্মিত।

মমতা যেন এক অ-সম প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে ক্রমাগত হঠতে হঠতে বারান্দার থাম পিছনে পেয়ে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি বিহ্বল। অনুমানে কৃষ্ণা গুপ্তাকে চিনল।

কৃষ্ণাও মৃদুপদে এগিয়ে এসে কপাট ধরে দাঁড়াল, বলল—'কে ভাস্করবাবু ?'

'জানিনে।'

মমতা শুনে চমকে উঠে পালাতে ব্যগ্র হোল।

কৃষ্ণা বলল—'কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি—যেন দেখেছি—তবু, স্মরণ হচ্ছে না তো!'

'পথের ভিড়ে কত মানুষ চোখে দেখা যায়, তাদের কি কেউ স্মরণ করে রাখে।'

মমতা অস্ফুট ধ্বনি করে থাম ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে বেগে চলে গেল। প্রায় একতলা সমান সারিবন্দী ঢালু সোপানশ্রেণী—মমতার ক্ষুদ্র শরীর ক্রমেই গতি বাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে মিলিয়ে যাচ্ছে।

লোচন আগেই গিয়েছিল। সনাতনও বিষণ্ণপদে বারান্দা থেকে ভিতরে চলে গেল।

কৃষ্ণা তাকিয়ে দেখল সব। তারপর কুঞ্চিত মুখ তুলে বলল—'কোথায় যেন—যেন—আচ্ছা, সেই শেকল-ভাঙার দিনে কি উনি ছিলেন না? আপনার সঙ্গে?'

ভাস্কর নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল—'হবে।' তবুও কৃষ্ণার স্মরণ করবার আগ্রহ তাকে আহত করল।

কৃষ্ণা ভাস্করের মুখের দিকে চেয়ে ছিল, গ্রীবা অল্প তুলি বলল—'হবে নয়, তাই। উনি কে ভাস্করবাবু?'

ভাস্কর আর জবাব দিল না।

কয়েকমুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। ভাস্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন স্মরণ করিয়ে দিতে বলল—'চলুন, কাজ খানিকটা এগিয়ে ফেলা যাক।'

'আর আজ থাক।' কৃষ্ণা বেশ পরিবর্তনের জন্য রওনা হয়েছিল, বলল—'বরঞ্চ একদিন যে সুরদাসের গান শোনাব বলেছিলাম—যাবেন? হয়তো আজ তিনি এসে পৌছবেন।'

'থাকই আজ।' ভাস্কর শুকনো একটু হাসতে চাইল—'তাহলে আপনার আনন্দও মাটি করব না।' সে অন্যমনে পথের দিকে তাকাল, মমতার সেই ধেয়ে নামাটা তখনও তার চোখের পরে ভাসছিল।

১৫

লজ্জা, লজ্জা, মর্মান্তিক লজ্জা! মমতা একটা মৃত্যুতুল্য নিষ্ঠুর আঘাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পথ বেয়ে ছুটে আসছিল। গতিবেগ নিঃশেষ হবার পূর্বমুহূর্তে নিজেদের ফটকে পৌছলে লাঞ্ছনার দুঃসহ ভার পাল্লায় ন্যস্ত করে দমহীন যন্ত্রের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। অপরাহ্ন বেলা। বাষ্পাকুল চোখে বাইরের রোয়াকে প্রথমেই যে-ব্যক্তি দৃষ্টিতে পড়ল—সে উদয়। ঘরে অন্যান্যের উপস্থিতিও অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

উদয় দর্শনকামীর ডাকে অল্প পূর্বে ওখান থেকে উঠে এসেছে। সে সংক্ষিপ্ত আলাপ চাপাকণ্ঠে শেষ করে বলল—'শেঠজীকে বোলো, বুঝলে?'

লোকটা যমুনাপ্রসাদের গোমস্তা, সে ঘাড় নাড়ল।

উদয় বলল—'কি আর আমি করতে পেরেছি—সে কিছু নয়। কিন্তু এতদিনে তার ইচ্ছে পুরবে বলে আমি আনন্দিত।'

'কিন্তু একটু বলবেন স্যার্ আমার হয়ে। ডিক্রিজারীর শমন গোপন, তদ্বির-তদারক সবই এই গরীবের হাত দিয়ে, যাতে দস্তুরিটা—'

'হবে হে, হবে—কি বললে তোমার নাম, রমাকান্ত? হবে।' উদয়ের উচ্চকণ্ঠে চকিত হয়ে লোকটা ফিরে দেখল, একটি তরুণী আসছে।

উদয় বলতে লাগল—'যাও হে এবার যাও। অফিস আর অফিস, এখন...সবই খাওয়া করে ছেড়েছ। মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকে?'

লোকটা আর কথা না বলে নমস্কার সেরে চলে গেল।

উদয় গিয়ে ঘরে ঢুকল, সে মমতাকে যেন দেখেনি। তার মনে মনে খটকা ছিল—আলোচনার কিছু মমতার কানে গেল কিনা।

উদয়ের কুণ্ঠার কারণ মমতারও অজানা থাকল না। সে কোনদিনই উদয়ের কোন ইচ্ছাকে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। এমন কি, তাদের এখন যে-আলোচনা চলছে—বোধহয় পশ্চিমে যাওয়া—তার পরও মমতার যা মনোভাব উদয়ের তা অজানা নয়। মমতা নিমেষের জন্য তার যাবার দিকে অসাড় বোধে চেয়ে রইল—নিমজ্জমান যেমন করে তৃণগুচ্ছ দেখে।

শেষে সেও উদয়ের ঘরে ঢুকবার কিছু পরে পর্দা ঠেলে নিঃশব্দে প্রবেশ করল। সে আঘাত নিয়ে ফিরেছিল—মুখে রক্তের চিহ্ন নেই, চোখে শ্রান্তি, ঠোঁটদুটো সাদা। মালতী 'এস' বলে পাশের জায়গা দেখিয়ে দিলে মমতা নীরব হয়ে বসল।

প্রস্তাব ছিল পশ্চিমে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু উদয় কথা বলল না, ভুবনবাবু আগুনহীন গড়গড়াটায় গোটাকত টান দিয়ে নিবে গিয়ে বসে রইলেন, এবং বসুমতী কাঁথার ঝুড়িটা পাশে রেখে এক মনে সেলাই করে যেতে লাগলেন—তিনি এদের আলোচনায় থেকেও ছিলেন না। নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে সদ্য-ত্যক্ত আলোচনা কণ্ঠচ্যুত হয়ে যেন ঘরময় গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরতে লাগল। কেউই তাকে অগ্রণী হয়ে গ্রহণ

করলেন না। মমতার মত নেই তা সবাই জানতেন, কিন্তু সেটা কি-পরিমাণ না-থাকা তার অত্যন্ত শুষ্ক চোখ-মুখ এবং ক্ষুণ্ণ নীরবতা যে একনিমেষে সমঝে দিয়েছিল।

কিন্তু নিস্তব্ধতা উদয়ের বেশীক্ষণ ভরসা হোল না। মমতা শুনে কি শোনেনি সে-খটকাও ছিল। সে কথা বললে নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে তার প্রত্যেকটা শব্দ অতি স্পষ্ট শোনা গেল—'তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমে যাওয়াই স্থির ?'

'সর্বসম্মতিক্রমে'! সে-যে আগে জোড়েনি 'স্বজন-অতিথি-নির্বিশেষে সর্বসমক্ষে'—সেও বিনয় বলতে হবে।

ভুবনবাবুও অনুরূপ গুরুত্ব নিয়ে জবাব দিলেন—'তা স্থির বৈকি!'

'আমি কিন্তু তিনটি মাসের আগে কাউকে ফিরতে দিচ্ছিনে' মৃন্ময়ী এবার মাথা দোলাল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

উদয় আরও কোন মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করল। শেষে বলল—'বে আমি দিন স্থির করি। ভাল কথা—মমতা এসেছেন, এই সঙ্গে মতামতটাও—' বলে সে মুখ তুললে মমতার চোখে চোখ পড়ল।

মমতা এতক্ষণ চেপে বসেছিল, এবার রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল—'আজ হয় না উদয়বাবু ? এখনই ?'

উদয় চমকে বলল—'কি ?'

'কোথাও চলে যাওয়া !'

'আপনি কি তামাসা করছেন ?' উদয় যে বুঝতে পারছে না তা স বোঝা গেল। সম্মতিও যার কাছ থেকে দুরাশা, তার মুখে এই বার আগ্রহ দুর্ঘটনার মতো।

'না উদয়বাবু।' মমতা বলল—'আমি তামাসা করছিনে। যা-হোক একটু ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।'

উদয় প্রত্যুত্তরও করতে পারল না। তারপর মুখ নামিয়ে শুধু বলল—আপনি তো জানেন, আমার দিক থেকে ত্রুটি হবে না। যখন স-বাড়ি আমার—আপনাদেরও।'

মমতা সেকথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল—'আর একমুহূর্ত নয়, একমুহূর্তও এখানে থাকলে দম আটকে যাবে। আমাদের বাঁচান, উদয়বাবু।'

'কালই আমি টেলি করে দেব।'

বসুমতী সেলাই ফেলে নির্বাক হয়ে ছিলেন। বললেন—'তুই কি পাগল হলি, খুকি? না উদয়, যদি কখনো যেতে হয় তাহলেও জিনিসপত্র গোছগাছ করা আছে—সময় লাগবে।'

উদয় ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত হোল।

মমতা মাথা নাড়তে লাগল—'না, না, দ্বিধা আপনাকে করতে দেব না—দেব না! কোন গোছগাছ নেই।' একটু থেমে বলল—'ভাবনা কি আপনি কম করেছেন, আমাদের জন্যে? সে-কি জানিনে? এই যে ইচ্ছায় পশ্চিমের বাড়িতে ডেকে নিচ্ছেন—কত খরচ হবে—এও তো আমাদের জন্যেই। মামা অসুস্থ, আমি দুর্বল, আমরা কেউই ভাল নই! নইলে আপনার জন্যে তো কিছু দরকার ছিল না। টেলি কি আজই হয় না?'

বসুমতী বললেন—'খুকি, আজ আশ্রমে গিয়েছিলি—খবর বললি না! বলবি চল।'

মমতা এ ইঙ্গিত গ্রহণ করল না। কিন্তু উত্তর দিল আত্মগত ভাবে—

'আশ্রম আর বাড়ি, বাড়ি আর আশ্রম—এ যেন হয়েছে এক অন্তরীণের কয়েদবাসের মতো। শেষ করো, শেষ করো, শেষ করো।'

উদয়ের এতটা আশা করতে বাধছিল। বিব্রত মুখে একবার বসুমতীকে দেখে বলল—'বলছিলাম যে, যেতে যখন হবে তখন গেলেই হবে। কিন্তু গোছগাছের জন্যে না হয়—'

মমতা কথা শেষ করতে দিল না। বলল—'না না, সে কিছুতে হবে না।'

উদয় নিস্পৃহের মতো বলল—'বেশ। তাহলে তাই। আমি দিচ্ছি টেলি করে।'

বসুমতী নিঃশ্বাস ফেলে ঝুড়িতে কাঁথা সুতো তুলতে লাগলেন।

একনজর সেদিকে চেয়ে মমতা বলল—'বাস্তবিক একস্থানে কয়েদ হয়ে থাকা, বারোমাস, তার বড় শাস্তি যেন আর নেই। সে যেন মরারও অধিক। আপনি আমাদের বাঁচালেন উদয়বাবু, আপনাকে ধন্যবাদ।'

কিন্তু যাকে শোনাতে এ-সকলের অবতারণা সেই বসুমতী আর কথা বললেন না।

যাওয়া স্থির হয়ে গেলে মমতা সহসা উঠে দাঁড়াল—'যাওয়া তাহলে স্থির—আর নড়চড় হবে না?' উদয় ঘাড় নাড়লে সে তৎক্ষণাৎ পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ঘরে অবশিষ্ট সকলে রইলেন, কিন্তু তেমনই স্তব্ধভাবে বসে। সবাই বুঝলেন এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন বিচিত্র, তেমন এ কেবল কারও কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার মতিস্থিরই নয়।

বসুমতী কাঁথার ঝুড়িটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভুবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের কি আর একবার চা পাঠিয়ে দেব?'

'এঁ্যা—তা সন্ধ্যাও তো হয়ে এল। কি বলো উদয়?'

'থাক না।' উদয়ের কণ্ঠ বিশেষ মোলায়েম নয়।

বসুমতী আর কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। ভুবনবাবু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অকস্মাৎ বলে উঠলেন—'উদয়, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি—সমস্ত হৃদয় দিয়ে।' কথাকয়টি বলতে যেন ব্যাকুল হয়ে ছিলেন।

উদয় জিজ্ঞাসুমুখে তাকাল।

ভুবনবাবু বললেন—'মানে তোমার এই স্পষ্ট হওয়াকে। যেকথা বলতেই হবে সেটি বলা চাই। এই দৃঢ়তার অভাবে নিজের জীবনে কত-যে ঠকেছি সে তো জানি। আজও যদি আমি শুধু দৃঢ় হতে পারতাম!'

তাহলে যা হতে পারত সেই জীবনী শুনতে, অথবা নিজের দৃঢ়তায় সম্পন্ন কর্মের ফলাফল দেখতে উদয়কে খুব উৎসুক লাগল না। সে বুঝছিল যত সহজে এখন চুকে গেল, শেষপর্যন্ত এত সহজ না-ও হতে পারে।

ভুবনবাবু আরও দু'একবার আলাপ জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অগত্যা নীরব হয়ে বসে থাকলেন।

মমতা মায়ের ঘনঘন ডাকে সজাগ হোল। রুদ্ধকক্ষের টেবিল থেকে অশ্রুধৌত মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু জবাব দিল না।

'খুকি! খুকি!'

বসুমতী কপাটের উপর করাঘাত করতে লাগলেন।

মমতা উঠল না। হৃদয়ভরা রোদনকে সংযত করতে সময় লাগছিল। দুহাতে চন্দনকাঠের ছোট একটা বাক্স আঁকড়ে ধরা, সে ঘরে এসেই ভাস্করের দেওয়া বুদ্ধমূর্তিকে ওর মধ্যে তুলে ফেলেছিল।

'খুকি! খুকি!'

হতাশ হয়ে বসুমতী বললেন—'এখন খুললি নে, কিন্তু একটু পরে আবার আসছি—তখন কোন কথাই শুনব না।'

ওকে যে সময় দেওয়া দরকার, তা তিনিও বুঝছিলেন।

তাঁর পদশব্দ মিলিয়ে গেলেই মমতা আবার রুদ্ধবাক্সের ডালার উপর নুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল—আবেগ কিছুতে থামতে চায় না। চোখের জল গণ্ড বেয়ে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বাক্সটাকে ভিজিয়ে তুলছে, বুঝি তার অন্তরস্থ ধ্যানী মূর্তিকেও। কিন্তু সেই আর্দ্র বুদ্ধ ভিন্ন রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে তার আর দ্বিতীয় সাক্ষী থাকল না।

১৬

কৃষ্ণা ভাস্করকে বলছিল—'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, কিছু যদি মনে না করেন।'

ভাস্কর বিস্মিত হয়ে ঘুরে বসল। বলল—'বলুন।'

লালকুঠিতে কয়েকদিন পরে সুরদাসের গান-উপলক্ষে সমাবেশ, কৃষ্ণাও পোষা হাসিকে অভ্যাগতদের মধ্যে পদ অনুসারে কমিয়ে বাড়িয়ে বিতরণ করছিল। হঠাৎ সেই দেয়াল-আয়নায় নজর পড়লে দেখেছিল—অলিন্দে বসবার যে আয়োজন, ভাস্কর একা সেখানে বসে। তার মন যে তখন এই আসর থেকে অনেক দূরে পৌঁছেছিল, বোঝা দুষ্কর নয়।

কৃষ্ণা ভাস্করের হাতার বোতাম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল—'ইচ্ছের উল্টোটা করা মানুষের স্বভাব নয়, মানুষ করে না; করলে অনুতাপের সীমা থাকে না—কেমন এই না?'

ভাস্কর চেয়ে রইল।

কৃষ্ণা একটু হাসবার ভান করে বলল—'না, তাই বলছি। কাউকে আঘাত করা অপমান করা আপনার স্বভাব নয়। আপনি গুণী দরদী শিল্পী—মানুষের গভীর পরিচয় নিয়ে আপনার কারবার। তাছাড়া দেখেছি কিনা, কোন কিছু আড়াল করে চলাও আপনার স্বাস্থ্যে পোষায় না।'

'কি বলতে চান?'

কৃষ্ণা হাসি টেনে মুখে পুরল, বলল—'এমন গুরুগম্ভীর চেহারা আপনার আগে দেখিনি যা সেদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি। সেদিন আপনার কি হয়েছিল, কেন অমন করে রেগে উঠলেন—জানিনে। তাঁকে বললেন চলে যেতে, শক্ত কথাও অনেক বলে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর দিলেন—কেউ না, পথ-ঘাটের চেনা কি কেউ মনে করে রাখে!'

'তারপর?'

'বলছি—কিন্তু তাতে নিজেকেও যেমন উত্তর দিতে পারেন নি, তেমন তিনি 'কেউ না' হলেও যে-দশা আপনার করে গেছেন তাকে তো 'কিছু না' বলে ওড়ানো চলে না!'

ভাস্কর শুকনো একটু হাসল—'সুতরাং অবাধ শূন্যে অনুমানের ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন?'

কৃষ্ণা মাথা নাড়ল, বলল—'শূন্যের কারবার কৃষ্ণার ধাতুতে সয় না। কৃষ্ণা আলাদা। মিথ্যে নয় যে কৌতূহল কিছু হয়েছিল—অনুমানও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু সনাতন সব মিটিয়ে দিল।'

'সনাতন?'

'হ্যাঁ, সে-ই। বলল—দিদিমণি, কিন্তু—'

'সনাতন বলল। আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ। [illegible] তারও আপনার মতো গভীর সংকোচ ছিল, তাই শুধু বলল—দিদিমণি। কিন্তু আর কিছু না বললেও তার দিদিমণির পর ব্যবহারে সে খুশী হয়নি—বোঝা গেল।'

ভাস্কর নিঃশব্দ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা বলল—'কে উনি? শুনিনি তো আপনার কোন বোন আছেন। বিয়েও হয়েছে বলে মনে হোল না। কোথায় থাকেন?'

ভাস্কর দম ফেলে চেয়ারের মধ্যে হেলে বসল। এমন সময় পাঁচু উপস্থিত, সে সংবাদ দিল—'এসে গেছেন।'

'কে, সুরদাসবাবু?' কৃষ্ণা বলল—'আসছি, তুমি দেখ।' পাঁচু চলে গেল।

ভাস্কর বলল—'আপনার বলা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো শোনা হোল না।' কৃষ্ণা একটু থেমে বলল—'চলুন হলে যাওয়া যাক। কিন্তু আমি বলি কি, যা করে আনন্দ নেই—বরঞ্চ দুঃখ—তেমন কিছু নাই বা করলেন! আপনার কাজ, অবসর, এমন কি এই গানের আসরও তাহলে যে মিছে হয়ে যাবে।'

ভাস্কর এ কথার অর্থ না বুঝে চেয়ে রইল।

চলতে চলতে কৃষ্ণা বলল—'হয়তো আপনার আত্মীয়ার এমন কিছু আছে যা আপনার মনের মতো নয়—এ-বিষয়ে কিছু বলায় সংকোচ পাই। আমার কথাও তা নয়। কিন্তু মনের মতো হোল না বলে কেউ মন-খারাপ করে বসে থাকে, তা আমার পছন্দ হয় না। আমি তো পারিনে। আজ আপনাকে এই আসরে কিছুটা সেই জন্যেও টেনে আনতে হোল—যা পাচ্ছি তাই মনে করে যা পাইনি তাকে ভুলে থাবার চেষ্টা করাই তো ভাল, ভাস্করবাবু!'

ভাস্কর কুণ্ঠিত মুখে উত্তর দিতে গেল। কিন্তু এই সময়ে হলে পৌঁছে নবাগত এক যুবকের পরে দৃষ্টি পড়ায় কৃষ্ণা ব্যস্তভাবে ক্রীড়া তুলি গুলিয়ে গেল। আশ্চর্য—এ সেই কৃষ্ণা, তেমনই রহস্যময়ী! নমস্ক বোঝাতে হাতদুটো একবার একত্র করেই বলে উঠল—'কতদিন প আমাদের দেখা, বলুন তো!'

অনেকে চকিত হলেন। সুরদাস কিন্তু কুণ্ঠিত হোল না। বর স্মিতমুখেই জবাব দিল—'হবে, মান্ধাতার আমলের পর।'

'অন্তত প্রস্তরযুগের পরে তো বটেই!' কৃষ্ণা হাসল—'আপনা গান সেই ঢাকায় শুনেছিলাম। তারপর বাবা বদলি হয়ে এলেন- আপনিও ঢাকা পড়লেন ঢাকা শহরে। কিন্তু, মনে থাকে যেন- এখানে আপনি আমার আবিষ্কার।'

'নির্গুণের আবিষ্কার করলে অপযশ হয়!'

'ইস্, তাই কিনা!' কৃষ্ণা মাসীমাদের দিকে একনজর চেয়ে বল —'একবার শুনলে কান থেকে আর যেতে চাইবে না। আসুন, পরিচ করিয়ে দি।' একে একে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি ভাস্করও বাদ পড়ল না।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে রত্ন পেলে সহসা বণিক যেমন তা মূল্য বোঝাতে এবং সেই সঙ্গে নিজের মূল্যদর্শিতা প্রকাশ করে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কৃষ্ণাও সুরদাসকে নিয়ে তেমন আতিশয্যে লিপ্ত হোল। তার দাবী, সে সুরদাসের পূর্ব-পরিচিত। আজ অব গুপ্তও দেরিতে ক্লাবে যাবেন, এবং গান আরম্ভের পূর্বে তাঁর পিছন পিছ মিস্ পাউয়েলকেও আসতে দেখা গেল। এঁরাও পূর্ব-পরিচিত সুরদাস গিয়ে অর্গানে বসলে একটা উৎসুক প্রত্যাশার ভিতর গান সু হোল।

যাঁরা গল্প করছিলেন গল্প তাদের অল্পক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল, কিছুতে আগ্রহ যারা প্রকাশ করেন না তাদেরও ঔৎসুক্য পরিস্ফুট, সমজদারেরা মাথা নাড়তে সুরু করলেন। কিন্তু এ-সবের কোনদিকেই সুরদাসের লক্ষ্য ছিল না। হৃদয়ের সমগ্র মাধুর্য এবং কণ্ঠের সমস্ত শক্তি ঢেলে সে শুধু সুমুখের একটি মাত্র শ্রোতাকেই প্রসন্ন করতে রত হোল।

এ-সাধনায় পাথরের দেবীও প্রসন্ন হয়ে বর দেন, আর কৃষ্ণা—যে প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়ে ছিল। উপস্থিত কেউ কেউ ফরমাজ করে শুনতে লাগলেন। দেখা গেল, এ-সম্বন্ধেও সুরদাস কম যায় না। সবই নর-নারীর হৃদয়-সম্বন্ধীয় গান—বিরহপ্রধান আধুনিক। কিন্তু গায়কের গলার দরদ অপূর্ব।

সবার সঙ্গে ভাস্করও মুগ্ধচিত্তে বসে ছিল। কদিন থেকে অস্পষ্ট একটা মর্মবেদনা তাকে ভিতরে ভিতরে ক্লিষ্ট করে চলেছিল। আজ অনুকূল সুরের টানে তারই একটা স্পষ্ট ছবি তার মথিত হৃদয়ের পর ফুটে উঠলে সে বিস্মিত হয়ে দেখছিল—সে ছবি কলা-লক্ষ্মীর নয় অথবা কৃষ্ণা গুপ্তারও নয়।

গান শেষ হোল। কৃষ্ণা প্রত্যেকটা গানের শেষে আবিষ্কারকের প্রাপ্য প্রশংসা কলরব করে আদায় করছিল, কিন্তু এবার সেও অন্যান্য শ্রোতার সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সুরদাস অর্গান ছেড়ে নিকটে এসে দাঁড়াল এবং সলজ্জ হেসে বলল—'এবার ছুটি দিতে হবে, নতুন জায়গা।'

কৃষ্ণা গাঢ় কণ্ঠে বলল—'যদি নামঞ্জুর করি?'

'সবিনয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করব।'

'প্রথম কারণ গৃহস্থ জলযোগের কিছু আয়োজন করেছেন, তার সদ্গতি করতে হবে।'

'সুসংবাদ। শুনি দ্বিতীয়টা?'

'একটা সর্ত—আবার কবে আসছেন বলুন।'

সুরদাস ঈষৎ হাসল, বলল—'বলুন, কবে।'

'আমরা রবিবারে রবিবাসর করি, রবিবারে।'

মিস্ পাউয়েল বললেন—'বেবি, দুদিন বাদ দিয়ে কেন একেবারে বুধবারেই করো না, তোমার জন্মতিথিও হবে!'

কৃষ্ণা হেসে উঠল—'সো কাইণ্ড অব্ ইউ! বুড়ো মেয়ের জন্মদিন কি এমন করে মনে রাখতে হয়!' কিন্তু পরক্ষণে সে কিঞ্চিৎ মলিন হয়ে গেল, বলল—'আজ মাত্র রবিবার। উনি কি এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে অতদিন থাকবেন!'

অবন গুপ্ত যাবেন বলে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি সুরদাসের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণা অপ্রতিভ হয়ে বলল—'কি—কি! শুনি?'

অবন গুপ্ত বাইরে চললেন, বললেন—'পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশেও ঘটনা ঘটতে পারে।'

'বাবু!' কৃষ্ণার গলায় অভিমান।

অবন গুপ্ত বললেন—'তুই কি পুরো সংবাদ জানিস নে? ট্রাভেলিং থেকে প্রোমোশন দিয়েই তো এখানে ওকে বদলি করেছে—অবশ্য অস্থায়ীভাবে।'

তিনি আর মিস্ পাউয়েল বিদায় নিলেন। কৃষ্ণা যেন বাক্যহারা হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—'খু-উব ভাল! এবারের জন্মদিন তাহলে আপনাকে নিয়ে সুরু—মানে আপনার গান দিয়ে।' অকস্মাৎ সে দূরস্থ ভাস্করের দিকে নজর পড়লে তেমনই আতিশয্য দিয়ে বলে উঠল—'খু-উব ভাল, নয় ভাস্করবাবু?'

ভাস্করের চমক ভাঙল। ঘরময় সকলের মধ্যে বসেও সে সকলের

থেকে আলাদা একটা গুরুভার মুড়ি দিয়ে স্থির হয়ে ছিল। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে বুঝতে পারে নি। নিজের ব্যথারই অনুরূপ গানের মূর্ছনায় চারপাশ ভরে উঠেছে, ঘরময় তার অনুকম্পন, খোলা জানলা-দরজা দিয়ে তার তরঙ্গ ভাসছে মুক্ত বাতাসে—সেই-যে ঘরে ও বাইরে মিলে একটা সক্রিয় পরিবেশ তার সঙ্গে সেও যেন এক বিচিত্র প্রবাহে মিশে ভেসে চলছিল। কেবল অতি সূক্ষ্ম একটু আত্মবোধ তার চেতনাকে লুপ্ত হতে দেয়নি। ঠিক কখন যে গান শেষ হয়েছে, অন্যান্যের সঙ্গে সেও মুগ্ধভাবে বাহবা দিয়েছে স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ শুনতে পেল কৃষ্ণা বলছে—'খুব ভাল, নয় ভাস্করবাবু? জন্মদিনের পার্টিতে উনি গান করবেন!'

ভাস্কর নিমেষে সোজা হয়ে বসল, বলল—'নিশ্চয়।'

সুরদাস কৃষ্ণাকে বলল—'কিন্তু কেবল ওই দিনটি মাপ করতে হবে, অন্যত্র কথা দিয়েছি।'

'উঁহু, শুনব না। বলুন—আসছেন?' ভাস্কর ব্যগ্রতা দেখাল।

এবার সুরদাস তার প্রায় সমবয়সী এই অপরিচিতের দিকে তাকাল। কৃষ্ণা যে এর সঙ্গে হলে এসেছিল এবং এখন আবার একেই কৃষ্ণা আহ্বান করল, সুরদাসের দৃষ্টি এড়ায়নি। মৃদু হেসে হাত জুড়ে বলল—'আনন্দ যে দিতে পেরেছি সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু—'

ভাস্কর বলল—'কোন 'কিন্তু' নেই। এ নিমন্ত্রণ একলা ওঁর নয়—আমারও, তা মনে রাখবেন বলুন।'

সুরদাস চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগল।

পাঁচু ঘুরছে নিজের কাজ নিয়ে। সে এসে কৃষ্ণাকে জানাল—'সব তৈরি।' অর্থাৎ সবার ঠাঁই প্রস্তুত।

অগত্যা সুরদাসকে স্বীকার করতে হোল।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে ভিতরে যাচ্ছেন, সশব্দে আনন্দ-উল্লাস করে। গান সবাইকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

সবাই গেলেও কৃষ্ণা দেখল, ভাস্কর গেল না, বলল—'আপনি?' সহসা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনার কি অসুখ ভাস্করবাবু?'

ভাস্কর হাসতে চাইল—'এমন কিছু নয়। সেই বুক আর পিঠের ব্যথাটা একটু—'

'লুকোচ্ছেন। শরীর আপনার কিছুতে ভাল নেই।'

ভাস্কর একটু থেমে বলল—'বরঞ্চ আজ আমি যাই।'

'যাবেন!' বলে কৃষ্ণা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। শেষে বলল—'বেশ। গাড়ি তো আছেই, নাহয় কাউকে সঙ্গে দিয়ে দি।' যে-কোন প্রকার শ্রান্তি বা উত্তেজনা ভাস্করের পক্ষে মারাত্মক হচ্ছিল, তা কৃষ্ণাও জানত।

ভাস্কর বলল—'না, আমি বেশ চলে যাব। তাছাড়া আপনার অতিথিরা আছেন, গাড়ির আজ প্রয়োজনও অনেক।'

'তা হয়তো আছে, কিন্তু—' কৃষ্ণার চোখ সহসা নিবিষ্ট হয়ে এল, বলল—'সত্যি বলুন তো—রাগ হয়েছে?'

'রাগ?' ভাস্কর বিস্মিত হোল।

'হ্যাঁ, রাগ। ওর সঙ্গে আমার ব্যবহারে আপনি কিছু মনে করেন নি?'

'না! কেন?' ভাস্কর ঘাড় নেড়ে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণা বলল—'ভালই তো, মনে না করাই তো উচিত। তাছাড়া পার্টি পুরনো-বন্ধু এ সব তো আমি ছাড়তে পারিনে—কারও মন-খারাপ হলেও নয়।'

আসলে ভাস্করকে অত্যন্ত বিমনা এবং শুষ্ক দেখাচ্ছিল।' কিন্তু কৃষ্ণা তার হেতু বোঝেনি।

ভাস্কর গম্ভীর হয়ে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল—'কেন আপনি মন-খারাপের কথা বার-বার ভাবছেন!' একটু থেমে যেন ইতস্তত করে বলল—'অবশ্য ইদানীং আমার দিনগুলো কিছু বিপর্যস্ত, শরীরও ভাল নয়। কিন্তু গাঢ় আঁধার না দিয়ে তো আলো আসে না! আজ—এখন—এই গানের পর কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে যে-প্রাণপ্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে আবার আমাদের শিল্প জীবন আদর্শ সব বেঁচে উঠতে পারে তার সন্ধান যেন এখানেই শুধু আছে—এই হলঘরে, আপনার এই নানা আয়োজনে। আপনি বলছেন 'রাগ'!'

অতিথিরা খেতে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে তাকাল।

ভাস্কর একটা আহত বোধের তাড়না থেকে বলতে লাগল—'একটু আগে বলছিলেন—সেদিনের কথা। তিনি কে, আগে তো বলিনি। বলবার প্রয়োজনই যে কখনো হোল না। তিনি অপরিচিত নন। কিন্তু সে-পরিচয় আমার শিল্পকে না রসিয়ে দিল, আমাকে না এগিয়ে দিল—তার মূল্য কতটুকু? যে-প্রেরণা এখানে পাই তার শতাংশও তো তার ছিল না!' তাই বটে, কথাগুলো ভাস্করেরই বটে। কিন্তু একদিন সে এ বলছে ভাবলেও ছুটে পালাবার দিশে পেত না।

কৃষ্ণা পা বাড়িয়েছিল, জিজ্ঞাসা করল—'একি মনের কথা?'

'মনের কথা!' ভাস্কর যেন প্রথমটায় আটকে গেল। কিন্তু বাধা পাওয়ায় গলা উঠল কেঁপে, বলল—'বলতে পারেন, তাকে যেতে বলায় বাধা ছিল কোথায়—পদে পদে যে বিঘ্ন ভিন্ন আশ্রয় ছিল না!' কিন্তু বলেই সহসা মুখ নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে বলল—'যাচ্ছি।'

সে দেখতে পেল না, কিন্তু কৃষ্ণার চোখ মুখ তখন বাঁকা হাসির ছটায় ভরে গেছে।

ভাস্কর বারান্দায় পৌঁছলে বাহাদুর ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এল—'যাচ্ছেন ?' ভাস্কর ঘাড় নাড়ল, কিন্তু দাঁড়াল না। বাহাদুর কৃষ্ণার জন্য দ্রুত এসে হলের দরজায় উঁকি মারল—'দিদিসাব্, বাবু যাচ্ছেন। গাড়ি কি—' প্রশ্ন তার অসমাপ্তই রয়ে গেল, দিদি-সাহেবার আচরণ দেখে। একা কেউ যে অমন করে চেপে চেপে হাসতে পারে, এ সে না দেখলে বিশ্বাস করত না।

কৃষ্ণা নিমেষে সংযত হয়ে গেল—'কি বাহাদুর ?'

'আজ্ঞে, বাবু যাচ্ছেন—গাড়ি যাবে তো ?'

'দরকার কি !'

'দরকার নেই ?' বাহাদুর চেয়ে রইল।

কৃষ্ণা বলল—'উনি কি চলে যান নি ? থাক গে, কি আর এখন অতটা দূরে যাবে—গাড়ির আজ প্রয়োজনও অনেক।' আবার তার মনে মনে হাসি এল, কথাটা কিনা ভাস্করেরই ! তারপর দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে গেল—অতিথিরা কখন সেখানে গেছেন।

বাহাদুর আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, শেষে ফিরে এল। কিন্তু বারান্দায় এসেও সে পথের দিকে না চেয়ে পারল না। সমস্ত পশ্চিম আকাশ রক্তিম মেঘে ছলছল করছে। পথের বাঁক পর্যন্ত যতখানি দেখা গেল তার মধ্যে ভাস্করকে কোথাও দেখতে পেল না। ভাবল, তাহলে হয়তো দিদিসাব্ আর বাবুর মধ্যে আগেই কথা স্থির হয়েছিল।

১৭

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। অতিশ্রান্ত ভাস্কর ম্লান আঁধারে একটা অস্পষ্ট কৃষ্ণ আকৃতির মতো ঝাউতলায় এসে পৌঁছিল। গরমে খুলে নেওয়া লম্বা জামাটাও কাঁধ থেকে ঝুলতে ঝুলতে আসছে, জামার হাতাদুটো গড়িয়ে নেমেছে মাটি পর্যন্ত—যেন সে তারই বিগত দিনের মৃতদেহকে পিঠে বহন করে ফিরছে। মনের ছবি বাইরে ফোটে না। ফুটলে দেখা যেত এতক্ষণ সেখানেও তার গত-কালের নানা স্মৃতি সিন্দাবাদের দৈত্য হয়ে কাঁধে চেপে সব চিন্তাকে হাঁপিয়ে তুলেছিল।

ভাস্কর নাক থেকে রুমাল সরিয়ে দাঁড়াল একটু। মাথার পরে ঝাউগাছ তেমনই শ্বসিয়ে যাচ্ছে। সুমুখে নিঃশব্দ আঁধার। তার পটে বাড়িখানা দেখাচ্ছে আরও গাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো। সেই আঁধার-আয়তন দূরে কিংবা কাছে যেন ঠাহর হয় না। ওরই গর্ভের মধ্যে আর একখানা কক্ষ এখন ভাবতে গিয়ে সে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস চেপে ফেলল। পলকের জন্য লালকুঠির আলোকোজ্জ্বল হলখানাও মনে পড়েছিল। গৃহের এমন অনাথমূর্তি দেখেনি কোনদিন।

জঙ্গল পেরিয়ে কিছুটা এগোলে বারান্দা থেকে টিমটিমে আলোর রশ্মি চোখে পড়ল। বোধ হয় তার পদশব্দেই হবে, সনাতন মুখ তুলে চেয়েছিল কিন্তু তাকে চিনতে পেরে মুখ নামিয়ে কাজে ব্যস্ত হোল—না দিল কোন সাড়া, না দেখাল আলো।

ভাস্কর এসে নিকটে দাঁড়ালেও তার আচরণে কোন বৈষম্য হোল না। বরঞ্চ কাজের প্রতি মনোযোগ আরও বেড়ে গেল। অদূরে কয়েকটা মোমাধার ও হারিকেন জড়ো করা ছিল। সুমুখে দুটো পিতলের প্রদীপ—তাতে তেলের বদলে মোমের পোড়া টুকরো সাজিয়ে রাখা, স্বয়ং সনাতন অপটু হাতে সলতে পাকাচ্ছিল।

এই বিরাট বাড়িতে বাতি দেবার আয়োজন বটে। ভাস্কর বিষণ্ণ হেসে জিজ্ঞাসা করল—'ওটা হচ্ছে কি?'

সনাতন উত্তর দিতে মুখ তুলেছিল, আবার নামিয়ে নিল।

'কি করছিস ওটা?'

'সংসারে যা করতে এসেছিলাম।' সনাতন উত্তর দিল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে ভাস্কর বিস্মিত হোল—সেটা এমনই শান্ত।

ভাস্কর আবার শ্রান্ত মুখে হাসতে গেল, হাসি এল না। বলল—'তেল নেই?'

সনাতন জবাব দিল না। কারণ,'নেই'-কথা সে মুখে আনে না।

'তেল বুঝি বাড়ন্ত সনাতন?'

'সবই বাড়ন্ত ভিন্ন বাড় আছে আর কিসের—এক দেনার ছাড়া? তোমার তো কিছুরই আর প্রয়োজন নেই।'

তার ভাব দেখে ভাস্কর থেমে গেল।

সনাতন সলতে পাকিয়ে চলতে লাগল। বলল—'দেনার কিস্তিগুলিও ভ্রূক্ষেপ করলে না, কমাস হয়ে গেল। কিন্তু দিনগুলো তো চালাতে হবে! আর সামনের এই রাত?' বলে মুখ তুলল।

ভাস্কর রুমালে নাক মুছে বলল—'থামো সনাতন। ও-সব এখন থাক।'

সনাতনের কাজ সহসা থেমে গেল। সে বলল—'থামব? আরও কত থামব আমায় বলতে পার! বছর প্রায় গড়াতে চলল সেই অলক্ষ্মী শিকল-ভাঙার পরে. কিন্তু আস্ত আছে কি? বজায় রইল কি? কোন দ্রব্যটা সংসারে আসে বলো—কোন সঞ্চয় কোন সাশ্রয় কোন বন্ধু! তেল কাঠ বাজার মশলা—কোনটা?'

'বেশ-তো, যদি বাড়ন্ত হয় আবার আনলেই আসবে।' ভাস্কর পাশ কাটাতে চাইল।

'আনলেই আসবে?' সনাতন সহসা উঠে ভিতরে চলে গেল এবং অল্প পরে চন্দনকাঠের বাক্সটা এনে উপস্থিত করল—'নাও, আর এই চিঠি।' সে বিকালে বাইরে থেকে ফিরে অবধি দেখছিল, এই দুটো এসেছে। কিছুতেই আর সইতে পারছিল না।

বাক্স দেখে ভাস্করেরও বুকের ভিতরটা দুলে মুচড়ে উঠল, ব্যথা কি তবে বেশী হবে!

সনাতন বারকত ডাইনে-বামে মাথা দুলিয়ে শেষে বলল—'আসে না, আসবে না। যা যায় সেতো আর আসে না!'

সনাতনের কথার ভিতর আর যাই থাক আন্তরিকতার অভাব ছিল না। যে এই স্মৃতি ফেরত দিয়ে নেপথ্য থেকে বিদায় নিয়ে গেছে তারও আর্দ্র ব্যথাভার ভাস্কর যেন দেখতে পেল। কিন্তু পরিবর্তন তারও হয়েছিল। তাই দুঃখ প্রকাশের পরিবর্তে সে ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল—'ফেরত দিয়ে গেছে তা কি, কাঁদতে হবে?'

সনাতন শান্তভাবে মাথা নাড়ল—'না। বরঞ্চ দশের কথা সত্যি হলে হাসবে। বাধা যা ছিল, এই একেবারে গেল।'

'সনাতন!'

সনাতনও তত-জোরেই জবাব দিল—'কি?' সহসা সে মুখ নামিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ভাস্কর একটু পরে আস্তে আস্তে নাক থেকে রুমাল সরিয়ে নিল, অস্ফুটস্বরে বলল—'ইস, এ-যে রক্ত। আবার আজই পড়তে লাগল।'

সারা-রাত দুজনের যা করে কাটল তা একমাত্র অন্তর্যামী জানেন।

একজন রইল আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর একজন ভীত কণ্ঠে অভয় শুনিয়ে প্রভাতের আশায় প্রহর গুনতে লাগল। আর রইল শিয়রে সেই টিমটিমে আলো—তেলের প্রদীপে মোমের টুকুরো দেওয়া।

ভোরের দিকে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়েছিল। সকালে শোবার ঘরে আপাদমস্তক ঢেকে ভাস্কর নির্জীবের মতো বসে। চন্দনের বাক্সটা টেবিলের কোণে রাখা, চিঠিখানা হাতের মধ্যে খোলা—কাল পড়া হয়নি। সেটাকেই সে নেড়েচেড়ে দেখছিল। সনাতন বলেনি, কিন্তু যমুনাপ্রসাদের চিঠি—সম্ভবত তার পিয়ন এসেছিল।

মাননীয় আদালত যে বাসের তিনটি ঘর ছাড়া অবশিষ্ট বাড়ি দখলের অনুমতি পূর্বেই দিয়েছেন, যমুনাপ্রসাদ এ-তথ্য সবিস্তারে ভাস্করের গোচর করেছেন। শেষে লিখেছেন, প্রাপ্য যদিও তিনি আইনত অবিলম্বেই আদায় করতে পারেন, তথাপি মহাশয়ের কুল-খ্যাতি বিবেচনা করে তার বিনীত অনুরোধ—মহাশয় যেন নিজগুণে অবিলম্বে দখল দেবার ব্যবস্থা করে তাঁর কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

ভাস্কর চিঠিখানা কয়েকবার শেষ করেও নীরব হয়ে ছিল। চিঠিতে বিনয় ছিল বটে, অবিনয়ও গোপন ছিল না। কিন্তু সে ভাবছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা—সম্পূর্ণ যোগবন্ধনহীন এই দুটি বস্তুর একই দিনে একই সময়ে এসে উপস্থিত হওয়া যেন ভাগ্যের পরিহাসের মতো।

সনাতন পথ্যের উচ্ছিষ্ট গেলাস-বাটি তুলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, ভাস্কর তাকে কোমলকণ্ঠে ডাকল—'সনাতন, এদিকে আয়—শোন।'

সনাতন এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল, তবু কথা বলতে ভাস্করের দেরি হতে লাগল। শেষে দুর্বল একটু হেসে বলল—'কাল তাহলে কখন দিয়ে গেল?'

সনাতন পত্রের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু ভাস্কর বাক্সটাকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কখন এসেছিলেন ?'

'দিদিমণি ? তিনি তো আসেন নি।'

'আর লুকোতে হয় না, আমি কি বুঝিনে ভাবিস ?'

'যথার্থই তিনি আসেন নি।'

ভাস্কর তথাপি নরম স্বরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—'তোমাকে না সে-বাড়ি যেতে মানা করেছিলাম ! দেখছি তবু গিয়েছিলে।'

সনাতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—দাদাবাবু বলে কি !

ভাস্কর বুঝিয়ে বলল—'যখন সে আর চায় না তখন কাজ কি সেখানে গিয়ে—বলতো ! মস্ত বড় এই পৃথিবী। এখানে আপনার জন খুঁজে পেতে দেরি হতেও পারে, তবু খুঁজলে পাওয়া যাবেই। জায়গাটাও যে মস্ত-বড় বুঝলি নে ?'

সনাতন মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে। বলল—'কিন্তু আমি তো সেখানে যাইনি।'

ভাস্কর গম্ভীর হোল, বলল—'ওটার কি তবে পাখা উঠেছিল ? আমাকে কি বোকা বোঝাচ্ছিস ?'

'চিঠিতে লেখা নেই ?' সনাতন বিস্ময়াপন্ন হোল—'লোচন যে বলল, লোকে দিয়ে গেছে।'

'একই লোক ? জানিস নে তুই।'

সনাতন মাথা নেড়ে স্বীকার করল—'বাড়ি ছিলাম না। লোচন, লোচন। সেই রকমই কিন্তু বলল।'

এবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাস্কর বলল—'সনাতন, পড়তে জানিস নে—নয় রে ?'

সনাতন চুপ করে থাকে। সে-যে পড়তে জানে না, এ তার মহাদুঃখ। তার রামায়ণ একখানা আছে বটে—নিত্য সহচর। কিন্তু অবসর পেলে পড়ুয়া খুঁজে তার পিছন পিছন ঘোরে—আজ একটু বসবে না ভাই! সেই-যে উত্তরকাণ্ডের সেই জায়গাটা—আহা চোখের জল রাখা যায় না! ভাস্কর এটা জানে। জানে বলেই উপলক্ষ পেলে একবার নাড়া দিয়ে মজা না করে ছাড়ে না। হয়তো এতক্ষণ তারই একটা মহলা চালাচ্ছিল—সনাতন মনে মনে ভাবল। নতুবা চিঠিতে থাকবে না সংবাদ?

ভাস্কর বলল—'বেশ জিনিস, এ-সংসারে ওই পড়তে না পারা। ওর মতো সুখ আর নেই! কত দুঃসহ জানার যন্ত্রণাই যে পোহাতে হয় না।'

সনাতন আবার মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল, বলল—'কিন্তু সংবাদ তো সব ভাল?'

'খুবই ভাল।'

সনাতন চেয়ে রইল।

ভাস্কর হাসার ভান করে বলল—'নারে, নতুন করে খারাপ কিছু নয়। একটু দেরি হয়তো হবে, তবু শরীর খানিক সারলেই আমি যাব।'

'যাবে?' সনাতন আকস্মাৎ হৃষ্ট হয়ে উঠল—'তাই একবার যাও।'

ভাস্কর ম্লান হাসল—'যাব, নয় রে?'

'হ্যাঁ, যাও একবারটি।' সনাতন বলল—'মানুষের মন নরম। রাগ করেছে বটে—চিঠিতেও বুঝছি কড়া কথাই লিখেছে—কিন্তু নিশ্চয় বলছি, একবার গিয়ে সামনে দাঁড়ালে না মিটে কখনো যায় না।'

'যদি বলে, দেরি হয়ে গেছে?'

'দেরি!' দেরি আবার কি। মানুষ কি ঘড়ি যে ঘণ্টা মিলিয়ে টিকটিক করে চলবে। দেরি, ভ্রান্তি—এসব জীবনে আছে না!'

'তাহলে একবার যাওয়াই দরকার, কি বলিস ?'

'অবিশ্যি।' সনাতন বুঝিয়ে বলল—'নাহলে এই বাড়ি-ঘর গেরস্থালি কিছুই কি রক্ষা হবে—কিছু থাকবে না! বনের প্রাণীরও যে একটা বাসা দরকার, দাদাবাবু!'

এ-কথায় ভাস্কর যেন আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে এল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিছুটা আত্মগত-ভাবে বলল—'যাব, শরীর সারুক। তাছাড়া এবার মাস্টারমশায়ের মূর্তিটাকেও শেষ করব।'

'করবে দাদাবাবু?'

'হুঁ। বছর ঘুরে এল, তাঁর আসার সময় হোল—টাকাও কিছু আসে। আর, সবাই মিলে এমন করে আমায় কোণঠাসা করবে সেও আমি দেব না—দেব না!' বলে উত্তেজনার সূত্রপাতেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সে সংবরণ করে নিল। দেখল, সনাতন মুখ নামিয়ে উচ্ছ্বাস চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সে মূর্তি শেষ-করবার সংকল্প শুনে অকস্মাৎ মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

ভাস্কর বলল—'কি হোল, কান্না নাকি রে?'

সনাতন তার সামনেই চোখ মুছে ফেলল—'কান্নাই দাদাবাবু। এই কান্নার জন্যে কর্তারা আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। দিদিমণি আসবেন, আবার তুমি মূর্তিতে হাত দেবে, আশ্রমের উৎসব আসছে, পুরস্কার আসছে'—বলতে বলতে বৃদ্ধ যেন আবিষ্ট হয়ে উঠল।

ভাস্কর বলল—'আর বনের প্রাণীর বাসাও যে টিকে থাকবে—সে কথা বললিনে?'

সনাতন প্রথমটায় আশ্চর্য হয়ে চোখ মেলে চেয়ে রইল, যেন বুঝতে পারেনি। শেষে বারকত মাথা নেড়ে বলল—'বাসা সবারই চাই—আছেও। কিন্তু তা বলে কি একে বোঝান যায়! এ গড়িতে যে

একজনই মাত্রই পারে—আর আমি, এই সনাতন, তাকে কোলে করে মানুষ করেছিলাম। ভগবান করুন, আর দিদিমণি আসুন—তারপর দেখো'—বলে সে সহসা চুপ করল।

ভাস্করও আর কথা বলল না। হয়তো সনাতনের ভুল শুধরে এখনই তাকে নিরাশ করতে ব্যথা বাজছিল, হয়তো তার নিজের মনেও আলোড়ন ওঠা বিচিত্র নয়। কাল সে বুদ্ধের মূর্তি ফেরত আসতে দেখায় প্রথমটায় নিজেকেই সামলাতে পারেনি।

মমতা গভীর এবং তিক্ত আঁধারের মধ্যে যখন আর আশার কোন আলোই দেখতে পায়নি, তখনই শুধু মূর্তিটাকে ফেরত পাঠিয়েছিল। যে-হৃদয় আর তাকে চায় না, তার উপহার সজল অভিমানে প্রত্যর্পণ না করে পারেনি। তবু মানুষের আশা—দু'এক দিন তার কেটে গেল একপ্রকার চকিত হয়ে হয়ে। মূর্তি হাতে পড়লে ভাস্করের যখন হোক উপস্থিত হওয়া সে দুরাশা বলে ভাবতে পারল না।

শেষে চোখ মুছে মাকে বলল—'মা, যেখানে হোক চলো। আর একদণ্ডও নয়।'

বসুমতীর মন উঠল না। তিনি মেয়ের কাছে কিছু কিছু শুনেছিলেন, তবু মেয়ের পরে আস্থাও কেমন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল—মেয়ের ওই উদয়ের পরেই ঝোঁক। বললেন—'আশ্রমের উৎসব তো আসছে, নাহয় এ-ক'টা দিন যাক না।'

ক্ষীণ একটু আশা তিনি তবু রেখেছিলেন।

মমতা সংক্ষেপে বলল—'না, আর নয়।'

তার পরদিনই তারা পশ্চিমে চলে গেল।

১৮

এবার ভাস্করের সেরে উঠতে সময় লাগছিল। মমতার অমনি করে বিদায় নেওয়া ও যমুনাপ্রসাদের চিঠি তার অন্তক্ষণের শেল হয়েছিল। তার উপর এই ভাবনা তাকে দুর্বল করতে লাগল যে, কৃষ্ণা এল না কেন। অন্তত সে কেন যায়নি ভেবে তার একটা সংবাদ নিতে আসা তো অসম্ভব ছিল না।

কদিন পরে আজ কিছুটা সবল হয়ে বসে সে মনে মনে হিসাব করে দেখছিল, কৃষ্ণার জন্মদিনের আর একদিন মোটে বাকী। কাল জন্মদিন। যমুনাপ্রসাদের ওখানে যেতে বের হচ্ছিল, স্থির করল ফিরে এসে বিকালে লালকুঠিতে যাবে।

রওনা হবে, সনাতন এসে জিজ্ঞাসা করল—'চিঠিখানা কি নিলে দাদাবাবু?' বৃদ্ধ সবই পূর্বের মতো হয়ে যাবার বাতাস পেয়ে এই কদিন অসুখ-বিসুখের অন্তরালেও আশার জাল বুনছিল।

'হ্যাঁ।'

'দাদাবাবু!'

ভাস্কর মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

সনাতন বলল—'অন্যায় আছেই সংসারে। বলেছি তো, হয়তো চিঠিতেও শক্তকথাই আছে। কিন্তু দোষ-ঘাট কোন মানুষের নেই।'

ভাস্কর এরও কোন জবাব দিল না।

সনাতন বলল—'একবার তার দিকটাও ভেবে দেখ। দেখে দেখে হতাশ হয়ে তবেই না চিঠি দিয়েছে!'

'কি বলতে চাস?' ভাস্কর মনে মনে প্রমাদ গুনল।

'মানিয়ে নিও!'

ভাস্করের মুখের উপর বিষণ্ণ একটা ছায়া পড়ল। কার চিঠি এবং তাই নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছে বলে সনাতনের ধারণা ভাস্কর জানত। ঠিক করল—ওঁর নয়। সে ফিরে এসে আনুপূর্বিক চিঠির কথা সনাতনকে বলবে।

সে চলে গেলেও সনাতন হাসিমুখে পিছন থেকে চেয়ে রইল। তার নিজেরও একবার ওই সঙ্গে যাবার ইচ্ছা না হয়েছিল তা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কতদিন সে 'খুকি' বলে ডাকেনি।

তার অর্ধেক সকাল কেটে গেল লঘুছন্দে কাজ করে। যে পরিশ্রম লোচনের সাহায্য ভিন্ন কিছুদিন থেকে করতে পারত না এবং যা করতে মমতারও কড়া নিষেধ ছিল, আজ সে সেগুলিও প্রায় সহজভাবে করে চলল। সব ঠিক হয়ে যাবে, একথা ভেবে বৃদ্ধ যেন লুপ্তশক্তি ফিরে পাচ্ছিল।

কিন্তু লোচন কোথায়? এই কদিন অসুখবিসুখের অন্তরালে লোচন প্রচুর ফাঁক খেলছিল। আজও সে তাকে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখেছে বলে স্মরণ হোল না। ডাকতে লাগল—'লোচন, লোচন!'

লোচনের সন্ধান নিতে বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল। লোচন অবশ্য কাঠের বোঝা পথের পাশে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা গুপ্তা। সনাতনের মুখের হাসি যেন ফুঁ-লেগে নিবে গেল, সে জানত না তো কখন এসেছেন!

ভাস্কর বাড়ি ছিল না, অতএব তাকে এগোতে হোল। লোচন তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—'আচ্ছা সোনা-দা, দাদাবাবু এই-না কিছু আগে একটু ভাল হওয়ায় দিদিমণির বাড়ি চলে গেলেন?'

সনাতন ঘাড় নাড়ল।

লোচন আবার জিজ্ঞাসা করল—'তিনি সেদিন ফিরে এসে দিদিমণির

বাক্স আর চিঠি পেলে, সেই যে মন ভেঙে অসুখে পড়েছিলেন আর কি উঠতে পেরেছিলেন? কদিন পরে আজই না প্রথম দাঁড়াতে পেরেছেন?'

সনাতন বলল—'হ্যাঁ।'

লোচন কৃষ্ণার দিকে ফিরে বলল—'তবে!' তারপর সে সনাতনকে বলতে লাগল—'দিদিসাহেব বলছে কিনা—দিদিমণি কে? বললাম সব। দিদিসাহেবেরই বা দোষ কি, উনি আসতেই তাঁকে কিনা যেতে হয়েছিল—দেখেন নি তো!'

'আঃ লোচন!' সনাতন শাসন করে বোঝাতে গেল যেন যে, যত সত্যই হোক সেকথায় তোমার আমার দরকার কি।

কিন্তু লোচনের চাকরিও বছর ঘুরেছিল, বুদ্ধিমান সে-ই কম কিসে। সে সনাতনের ইঙ্গিত বুঝেছে দেখিয়ে থামার বদলে হেসে বলল—'লোকে তাই বলে বটে, থামতে বলা। আবার তারাই কিন্তু বলে—লোকের মুখ থামাবে কি দিয়ে! নইলে কে না জানে, ভোলানাথ দাদাবাবু—'

'আঃ!' সনাতন ধমকে উঠল—'যাও নিজের কাজে!'

লোচনকে পাঠিয়ে দিয়ে সনাতন কৃষ্ণার কাছে গেল—'বসবে চলো।'

কিন্তু কৃষ্ণার হাবভাব দেখে সে আশ্চর্য হোল। কৃষ্ণার হাসিভাবও মোছেনি, সনাতনের আহ্বানও সে গায়ে মাখল না। জোর করে একটু হেসে বলল—'তোমার দাদাবাবু বুঝি বাড়ি নেই?'

সনাতন মাথা নাড়ল।

'জন্মদিনের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। এলে মর্মে করিয়ে দিও।'

সনাতন স্বীকার করল।

'কাল সকালেই যেতে ব'লো, কেমন!'

'বলব।'

কৃষ্ণা সেখান থেকেই ফিরে যাচ্ছে দেখে, সনাতন একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল—'একটা নিবেদন ছিল।'

'বেশ তো, বলো।'

সনাতন মুখ নামিয়ে গামছার কোনা পাট করতে লাগল।

কৃষ্ণা বলল—'কিছু চাই ?'

'তুমি আর দাদাবাবুকে অমন করে ঘুরিয়ো না। মরে যাচ্ছি আমরা, তাকিয়ে দেখ। তিনিও বাঁচছেন না।'

'বেশ তো, তাঁকে বললেই পারো।' কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে গেল।

'বলেছি।' সনাতন ঘাড় নাড়ল—'তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, তাই সেখানে গেছেন।'

'হবে!' কৃষ্ণা বলল।

'কেবল তুমি আর তাকে টেন না—এইটুক দয়া করো।'

'দেখি! কি করতে পারি!' কৃষ্ণা গম্ভীর হয়েও হাসল একটু। কিছুক্ষণ থেমে বলল—'কিন্তু সনাতন, তুমি কি শোননি—লোকেও কি তোমায় বলেনি যে, আমাদের গাঁথার চাইতে খেলাবার লোভই বেশী!' বলে ফিক্-করে একটু হাসল।

সনাতন মনে মনে শিউরে উঠল। সে কৃষ্ণার মুখের দিকে চাইতেও পারল না।

কৃষ্ণা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বলল—'নেমন্তন্নের কথা কিন্তু চেপে যেও না। তাহলে আবার আমাকে এসে ধরে নিয়ে যেতে হবে। কেমন!' বলেই হেসে সনাতনকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে কৃষ্ণা চলে গেল।

সনাতন যেন মাটির পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের দোলা খেতে লাগল, এমনি অবস্থা।

কিন্তু কৃষ্ণা যাকে মনে করিয়ে দিতে বলে গেল সে নিজেই সেকথা

ভোলেনি। অসুখের মধ্যেও নয়, তার পরেও নয়। যমুনাপ্রসাদের বাড়ি থেকে ফিরে আসতে ভাস্করের দুপুর গড়াচ্ছিল এবং সে মনে মনে এই প্রসঙ্গই আলোচনা করে দীর্ঘপথ চলে আসছিল। তার কারণও ঘটেছিল।

যমুনাপ্রসাদ তাকে দেখে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বোঝা শক্ত। কিন্তু যখন প্রাথমিক আলোচনার পর ভাস্কর বলল—'ঋণ আমি শোধ করে দেব। আর ক'টা দিন সময় দিতে হবে—অবশ্য সম্ভব যদি হয়।' তখন সহসাই যমুনাপ্রসাদ সদ্য-মিলানো বন্ধকী-দলিলের দপ্তরটা সামনে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে হাসতে লাগলেন। আগেই সেগুলি তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছিল। বললেন—'সম্ভব? বিলক্ষণ! আপনি বলছেন আর সম্ভব হবে না? ওরে কেউ চায়ের কাপদুটো নিয়ে যা!'

একটু থেমে যমুনাপ্রসাদ আবার বললেন—'দেখুন, সুদকষে খাই, দালালিও করি—তাবলে বড় হয়ে বড়র মান বুঝব না! এই কি ভাবেন? স্বর্গীয় রাজা বোসের পৌত্র এসেছেন আমার বাড়ি, নিজের মুখে কিছু চাইছেন—আর আমি বলব 'অসম্ভব'!'

শেঠ হয়তো হিসাবে কিছু আবিষ্কার করে সদয় হয়েছিলেন, কিন্তু ভাস্কর উঠল কুণ্ঠিত হয়ে। বলতে লাগল—'না, না সে কিছু নয়। আসা হয়তো পূর্বেই উচিত ছিল।'

'উচিত!' যমুনাপ্রসাদ হাসতে লাগলেন—'এবার আপনি লজ্জা দিচ্ছেন কিন্তু।'

সহসা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—'লোকে হয়তো তাই বলবে। বলবে যে, ডিক্রীজারীর সময় এসেছে বলে অথবা হয়তো আজ পাইক-পেয়াদা নোটিশ নিয়ে ঘরে উপস্থিত দেখে আপনি এসেছেন। কিন্তু আমি তা ভেবেছি, ভাববেন না। হপ্তাখানেকের কথা বলছিলেন —নয়?'

ভাস্কর মাথা নাড়ল।

যমুনাপ্রসাদ বললেন—'হপ্তাখানেক বেশী কথা নয়, ক'টা দিনে কি আর এমন অঘটন ঘটবে! অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না, তাও ঠিক। হকের ধন অনেকবারই বেহাত হয়ে গেছে। তবু মানীর মান রাখতে হবে বৈকি—কি বলেন? ওহে রমাকান্ত, দপ্তরটা নিয়ে যাও না—বেশ, তাই দেবেন।'

কিন্তু এর পর তার উৎসুক চোখ নিমেষের জন্যও ভাস্করের মুখ ছেড়ে সরে গেল না।

ভাস্কর নমস্কার করে উঠে আসছিল, তিনি আর্দ্রকণ্ঠে ডাকলেন—'ভাস্করবাবু!'

ভাস্কর ফিরে চাইলে যমুনাপ্রসাদ চেয়ার দেখিয়ে বললেন—'বসুন—বাড়িই যাবেন তো।' সে বসলে বললেন—'মোটে হপ্তাখানেকের ওয়াদা নিলেন কিনা—তাই বলছি! বাড়িটা কি একেবারেই বেচে দিচ্ছেন?'

'কই না!'

যমুনাপ্রসাদ স্বস্তি পেয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—'তাও তো বটে। ডিক্রি হওয়া বাড়ি, ও বেচেও ফ্যাসাদ, কিনেও ফ্যাসাদ। টাকাটা তাহলে গুপ্তসাহেবই দিচ্ছেন?'

'কে গুপ্তসাহেব?'

'না না, যদি গোপনীয় হয় তবে শুনতে চাইনে—বলবেনই বা কেন। কিন্তু মানুষকে জালে ফেলতে কত ফাঁদই আছে, জানি কিনা! আপনি হয়তো কুণ্ঠিত হচ্ছেন, থাক তবে।'

'বলুন, বলুন বৈকি।'

তখন যমুনাপ্রসাদ পলকের জন্য দৃষ্টিটা একবার নামিয়ে নিয়েছিলেন.

বলেছিলেন—'তাঁর ওই-যে মেয়েটি—কি নাম বলে—হ্যাঁ কৃষ্ণাদেবী। শুনি যে আপনাদের পরস্পরের অনুরাগ, মানে বিবাহের একটা প্রস্তাবও নাকি—অবশ্য সবই আমার শোনা।'

'তারপর?'

কিন্তু তার চোখমুখ দেখে যমুনাপ্রসাদের খটকা লেগে গেল, বললেন—'তাহলে হয়তো গুজবই হবে।' তবু একটু পরে তিনি আবার বললেন—'কিন্তু বাড়িটা ঋণমুক্ত করে কন্যা-জমাতাকে যৌতুক দেওয়া তো তাঁর পক্ষে শক্তকথা নয়।'

ভাস্কর বুঝছিল, ভদ্রলোক জমি-বাড়ি বেহাত হবার দুঃস্বপ্ন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বলল—'হপ্তাখানেকের শেষে দুজায়গায় টাকা পাবার কথা, তাই সময় নিলাম। নমস্কার।' বলে মাথাটা একটু দুলিয়ে সে বেরিয়ে এসেছিল।

যমুনাপ্রসাদের অনুমান তার প্রথম-শ্রবণে অতিশয় কটু বলে ঠেকেছিল। কিন্তু এখন পথে আসতে আসতে যতবার যাচাই করে দেখল তেমন আর বিস্বাদ লাগল না। কদিন পরে পথ-হাঁটার শ্রম তাকে ক্লান্ত করতে লাগল, রোদের তাপও অসহ্য। তবু আজই লালকুঠি যাবে এ-চিন্তা অনুকূল হাওয়ার মতো তাকে স্নিগ্ধভাবে বয়ে নিয়ে চলল, ভাঙতে দিল না।

বাড়ি পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। কিন্তু পৌঁছে সে রীতিমত বিস্মিত হয়ে উঠল। চারদিকে নিশীথের মতো নিস্তব্ধ দুপুর খাঁ-খাঁ করছে, সদরের জানলা-দরজা সব বন্ধ—এরা গেল কোথায়!

কয়েকবার কপাট ঠেলল, কড়া নাড়ল, শেষে ভাবিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ইদানীং একপ্রকার নিশাচর হলেও গভীর রাত্রেও দরজায় পৌঁছে এ-ভোগ পোহায়নি।

দেরি হলে কি-সর্বনাশ হোত। তাই কি আমি হতে দিতে পারি, না তোরাই তাই চাস!'

'নাঃ, আমি তো আর কিছু চাইব না।' বলে সনাতন মুখ আঁধার করে চলে গেল। তার যাওয়াটা যেমন অশিষ্ট তেমন অত্যন্ত রূঢ়।

ভাস্করের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

সনাতন কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল এবং যেন অতিশয় শুকনো কর্তব্য করছে এইভাবে জানাল—'লালকুঠি থেকে এসেছিলেন।'

'কে?'

'তিনি—দিদিসাহেব।'

ভাস্কর চমকে বলল—'কখন?'

'সকালে—তোমার সংবাদ নিতে, নেমন্তন্ন করতে।'

ভাস্করের মুখ শঙ্কায় ভরে গেল। সে কোথায় গেছে বলে সনাতনের ধারণা ছিল, জানত। বলল—'কি বললি?'

সনাতন চুপ করে থাকল।

'আপনি কি বললেন, শুনি!'

'যা জানতাম তাই।' সনাতন বলল।

ভাস্কর ভ্রূকুটি করল—'তবু?'

সনাতন লোচনের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তারপর বলল—'তুমি দিদিমণির বাক্স আর চিঠি পেয়ে অসুখে পড়েছিলে, সেরে উঠে দেখা করতে গেছ। তাই।'

ভাস্কর যেন লাফিয়ে উঠল—'তাই! দেখা করতে গেছ—না? দেখা করতে গেছ! নচ্ছার, মিথ্যেবাদী!' থেমেই আবার বলতে

লাগল—'সবটাতে নাক ঢোকাবার দরকার কি তোদের! চাকর, চাকরের মতো থাকতে পারিসনে!'

'চাকর!'

'না, আপনি অভিভাবক! মিথ্যেবাদী, পাজী, নচ্ছার!'

ভাস্কর যেন ফুটতে ফুটতে বেরিয়ে চলে গেল।

১৯

কাল আর ভাস্করের লালকুঠিতে যাওয়া হয়নি। অসুখের পর প্রথমদিনেই পথশ্রম ও বাড়ি এসে বিপর্যয় তাকে নির্জীব করে রেখেছিল। কিন্তু আজ সকাল হতেই সে উচ্চ সাড়া-শব্দ তুলে যাবার আয়োজন করতে লাগল।

সনাতন ব্যবধান একটা বজায় রেখেছিল। কুঠির প্রসঙ্গে ভাস্করও তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত। কিন্তু আজ নীরবে বাসিকাজ সারতে এসে সনাতন দেখল—মনিবের বিনিদ্রমুখে প্রসাধন মাখা, কৃশ শরীরে দামী পোষাক ঢলঢল করছে, বুক পকেটের কোনা থেকে উঁকি মারছে রুমাল। ভাস্কর তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন জেদভরেই চুলের উপর ব্যাক-ব্রাশ চালাতে লাগল।

সনাতনও বুঝতে পারল চুল আঁচড়ান তাকে দেখে দীর্ঘতর হচ্ছে। সে মেঝেয় ছাড়া কাপড়-চোপড় তোলার ছলে নিচু হলে দুজনের আয়নার মধ্যে চোখাচোখি হোল। ভাস্কর চকিত হয়ে শক্ত হয়ে গেল এবং টেবিল থেকে চন্দনকাঠের বাক্সটা নিয়ে রওনা হতে ঘুরে দাঁড়াল। বাক্সের ডালাটাকেও শব্দ করে খুলল একবার।

সনাতনের মন বিষাদে ভরে গেল। খুকি বড় অভিমান করে ফেরত দিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণার জন্মদিনের উপহার ওই চলল নাকি ? সে ভীতিপূর্ণ চোখে মনিবের দিকে চেয়ে রইল, যেন মাত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়েই তাকে নিরস্ত করতে চায়। অথচ মনে মনে জানত, কোন ইচ্ছাশক্তিই আর ওকে থামাতে পারবে না।

ভাস্কর বাক্সটাকে যথাস্থানে রেখে দিল, পকেটে অন্য উপহার ছিল। তারপর কোনদিকে চোখ না দিয়ে জুতোর মসমস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে পৌঁছে জুতোর শব্দ একবার একটু থামল, এবং অত্যন্ত কড়া মনিবের ভাষায় আদেশ এল—'ফিরে এসে কাজে লাগব। মাটি তৈরি চাই।'

এবার জুতোর মসমস শব্দ বারান্দা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

যার কোনদিন শত নৈরাশ্যেও ধৈর্য যায়নি সেই বৃদ্ধের আজ 'বুড়োকর্তাদের' তৈলচিত্র মুছতে গিয়ে চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল পড়ছিল।

ভাস্কর তার পায়ের জোর ক্রমেই বাড়াচ্ছিল। তবু লালকুঠির সামনে পৌঁছলে দেখতে পেল গেটের পাশে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। অতিথিদের এক-আধ টুকরো হাস-পরিহাস শোনা যাচ্ছে। সে পকেট থেকে ঘড়ি নিয়ে এক নজর চেয়েই আবার ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গেল। আজকাল তার গতির দুর্গতি এমনই দাঁড়াচ্ছিল, জোরে হাঁটতে কষ্ট হয়। দেহের নীচে পা যেন ভেঙে আসে।

উপলক্ষের অনুরূপ করে হলঘর সাজান হয়েছে। ঘরময় ফুল ও মালার প্রাচুর্য। নিমন্ত্রিতেরা গণ্যমান্য। তার আগমন উপস্থিত কারও চোখে পড়ল না। অথচ সারাপথ তার একথা ভেবে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না যে, পৌঁছতে দেরি হলে যেসব অনুযোগ উঠবে তার আর

জবাবদিহি করা চলবে না। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই জানত, কারও বিলম্ব যে ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে সেকথা এঁরা বিশ্বাস করেন না।

কৃষ্ণাও তার জন্মদিনে এগিয়ে এল না, ভাস্কর নিরুৎসাহ হোল। সনাতনরা যাই বলে থাকুক তারা আনাড়ী। কৃষ্ণা কি তবে তাদের কথাই ধরবে!

কৃষ্ণাকে দেখা যাচ্ছিল হলঘরের বিপরীত কোণে। সে উপহারের টেবিলের পাশে স্বরদাসকে চপলহাস্যে এটা-ওটা দেখাতে ব্যস্ত। একবার যেন কি-কারণে এদিকে চেয়েছিল, ভাস্কর রওনা হতে গেল, কিন্তু কৃষ্ণা আবার মুখ নামিয়ে অতিথির সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হোল।

'ভাস্করবাবু!'

এতক্ষণ যে-মেয়েটি পাশের টেবিল থেকে তার দিকে তীব্র চোখে চেয়েছিল সে-ই তাকে সমাদরে আহ্বান করল।

ভাস্কর বলল—'আমাকে বলছেন?'

তরুণী এবার নিঃসন্দেহে চিনে বলল—'হ্যাঁ। আসুন।'

ভাস্কর তবু কিছুক্ষণ কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থেকে এগিয়ে এল। মেয়েটি তার অপ্রস্তুত-ভাব দেখেনি তো?

ভাস্কর বসলে তরুণী বলল—'ডেকে বসালাম বটে, কিন্তু চিনতে পারেন নি।'

'হ্যাঁ—তা মিস্—'

'আমার নাম শাশ্বতী সেন।' তরুণী হাসল—'চিনবার কথাও নয়। বছরখানেক আগে একবার দেখা হয়েছিল। এই বাড়িতেই। আপনি যেবার প্রথম আসেন।'

ভাস্করকে আর চিনিয়ে দেবার দরকার ছিল না, সে এবার মাথা নাড়ল।

শাশ্বতী বলল—'প্রথমে চিনতে পারলেন না, কিন্তু আমি বলব আপনাকেই আর চেনা যায় না। কখন থেকে চেয়ে আছি! কি হয়েছে ভাস্করবাবু, অসুখ করেছে?' প্রায় অপরিচিতা হলেও তার আগ্রহে বেদনা ছিল।

ভাস্করের বুকের ভিতর তোলপাড় হতে লাগল, কিন্তু সে প্রকাশ হতে দিল না। কেবল সৌজন্য দেখিয়ে একটু হাসল।

শাশ্বতী বলল—'আপনাকে এবারেও এখানে দেখব ভাবিনি, এ-বেশে তো নয়ই।'

ভাস্কর মুখের হাসিভাবটা বজায় রাখল মাত্র।

শাশ্বতী আর প্রশ্ন করল না, বরঞ্চ সে নিজের কথাই বলল—'এখানে থাকিনে, কাল এসেছি। সেবার ঘটেনি, এবার কবে দেখব বলুন?'

'কি?'

'শুনেছি আপনাদের অনেক পুরনো-সম্পদ আছে। তাছাড়া আপনার স্টুডিয়ো—এতদিনে সেটাও নিশ্চয় পূর্ণ হয়ে গেছে?'

ভাস্করের অস্বস্তি লাগল। বলল—'হবার কথাই বটে—'

'আর, তা হয়েছেও।' শাশ্বতী হেসে উঠল—'সে আপনার চেহারা দেখলে বোঝা যায়। তবু এ কিন্তু ভারী অন্যায়!' শাশ্বতী মুখ গম্ভীর করে আনল।

ভাস্কর বিস্মিত হয়ে তাকাল।

শাশ্বতী বলল—'হোক শিল্পের জন্যে, তবু সৃষ্টির তাগিদে শরীরের পর অবিচার করেছেন।'

ভাস্কর তার কথার ধরনে মনে মনে বিব্রত হয়ে উঠল।

শাশ্বতী বলল—'প্রতিভাদের দেহের এই জ্বালা। সব সময় বিরাট

আকারের মনের ওজন বয়ে চলতে খর্ব হয়েই থাকে—ওই, আপনার হোস্ট আসছেন।'

ভাস্কর দেখল কৃষ্ণা আসছে। তার আর উৎসাহ ছিল না, তবু পকেটে হাত রেখে যখন উঠে দাঁড়াল উৎসাহই প্রকাশ পেল। এবং কৃষ্ণা সুরদাসকে পাশে রেখে এগিয়ে এলে, সে আগ্রহবশে যা বলে উঠল তাতে নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল—'কৃষ্ণা! একটু দেরি হয়ে গেছে! এর আগে আর আসতেই পারলাম না।'

আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে সে আর কোনদিন নাম ধরে ডাকেনি। এ সংকল্পও তার ছিল না, কিংবা অন্যান্যদের সামনে তাদের অন্তরঙ্গতা দেখাবার চেষ্টা যে এমন উগ্র হয়ে উঠবে তা সে নিজেও ভাবেনি।

কৃষ্ণা মাপা হাসির চেয়ে একটু বেশীই হাসল এবং তার চাইতেও বেশী হাসল মনে মনে। বলল—'নমস্কার। ভেবেছিলাম তিনি আপনাকে ছুটি দেবেন না। মিলেছে দেখছি!'

এই কি জন্মদিনের সম্ভাষণ!

ভাস্কর সহসা অতিরিক্ত হাসতে লাগল। পকেট থেকে একটা আকবরী মোহর-খান নিয়ে বলল—'তোমার জন্মদিনের উপহার। নাও। দীর্ঘজীবন কামনা করি।' বলেই আবার আরক্ত হোল—'তুমি' এসে যাওয়ায়।

কৃষ্ণাও নিমেষের জন্য গম্ভীর হয়ে দ্বিগুণ জোরে হেসে উঠল। মোহর নিয়ে নেড়েচেড়ে মত দিল—'বিউটিফুল। ওহো আপনাকে যে চা-ই দেয়নি এখনো—বেয়ারা!'

ভাস্কর শুকনো মুখে হাসতে লাগল—'থাক, থাক, সে একসময় হলেই হবে।'

'হলেই হবে! তাহলেই আর হয়েছে।' কৃষ্ণা একবার পলকের

অন্য শাশ্বতীর দিকে তাকাল। তারপর বোধ হয় বছরখানেক আগের একটা সন্ধ্যার কথাই মনে পড়েছিল, বলে উঠল—'ওদের পরে বিশ্বাস আছে নাকি! ভিড়ের বাড়িতে কে কখন আসছে, কখন যাচ্ছে—ওরা রাখবে নজর! বেয়ারা!' বলে সে নেপথ্যে চেয়ে সাগ্রহভাবে এগিয়ে গেল।

ভাস্করও সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখল শাশ্বতী মুখ নামিয়ে আছে।

এতক্ষণ সুরদাস কথা বলেনি। এবার সে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সহাস্যে বলল—'নমস্কার। আপনার নেমন্তন্ন রাখতে এলাম।'

'ধন্যবাদ।' ভাস্কর বলল।

সুরদাস বলল—'অবশ্য অন্য জায়গায় কথাও খেলাপ হোল। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বন্ধুজনের নিমন্ত্রণ—সাধা লক্ষ্মী হেলা করতে নেই।' বলে সে বলিষ্ঠস্বরে হাসতে লাগল।

কৃষ্ণা অল্পক্ষণেই বেয়ারার সঙ্গে চা খাবার নিয়ে উপস্থিত হোল। সেগুলি আগ্রহভরে টিপয়ের পরে একে একে সাজাতে লাগল। কিন্তু ভাস্করের সেদিকে মনোযোগ দেবার সাধ্য ছিল না। সে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করল—'বাস্ত কি খুব বেশী?'

কৃষ্ণা বলল—'সত্যি আজ আর সময় পাচ্ছিনে। তা'বলে চলে যাবেন না।'

'আচ্ছা। কিন্তু কাল? কাল তো সময় হবে?' ভাস্কর কণ্ঠস্বর অক্ষুণ্ণ রেখে দেখাতে চাইল যেন সে আহত হয়নি। শাশ্বতী সংকুচিত হয়ে উঠল।

ভাবে হাসল, বলল—'কিন্তু ইনি যে আজ এই সর্তে এখানে এসেছেন যে, আমি কাল বিকেলে ওর সঙ্গে জলসাতে যাব!'

'বিকেলে? ও, তাহলে সন্ধ্যের পরেই হবে। দরকার খুবই কিনা।' ভাস্কর দেখাতে চাইল যেন তারা সন্ধ্যার পরেও হামেশাই এমন ঘনিষ্ঠ আলাপে অভ্যস্ত।

কৃষ্ণা বলল—'জলসা থেকে ফিরেই যে আমরা থিয়েটারে যাব ভাস্করবাবু!' বলে সে একমুহূর্ত মৌন থেকে যেন শাশ্বতীকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—'তুমি তো ভাই আত্মীয়। দেখো, আমার অতিথির যেন কষ্ট না হয়—দেখো কিন্তু।' বলেই কৃষ্ণা দ্রুতপায়ে দরজার দিকে চলে গেল, দু'জন অতিথিও তখন আসছিলেন। সে শাশ্বতীকে আপত্তি করবার সময় পর্যন্ত দিল না। সুরদাসও চলে গেল।

ভাস্কর নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

শাশ্বতী আর কথা বলল না, তার কাছে কিছুই যেন আর গোপন ছিল না। কিছুক্ষণ চলে গেলে জিজ্ঞাসা করল—'ওকে কি দরকারের কথা বলছিলেন?'

ভাস্কর অন্যমনস্কের মতো বলল—'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ কি?'

'ও!' বলে ভাস্কর হঠাৎ তার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—'নমস্কার। কিন্তু আমি যাই।'

'সেকি, এসব ছুঁলেন না যে!' শাশ্বতী বিস্ময়াপন্ন হোল।

'তা হোক।'

ভাস্কর রওনা হয়ে এলে শাশ্বতীও পিছন পিছন উঠে এল—'ভাস্করবাবু, কি হয়েছে?'

'কিন্তু কবে আপনার স্টুডিয়োয় যাব, সে-তো বললেন না!'

'আর একদিন। আমায় মাপ করবেন।' বলেই ভাস্কর রওনা হয়ে গেল। বৈশাখের রৌদ্রে তখন পথ-ঘাট তেতে উঠছে। ভাস্কর হনহন করে চলতে লাগল।

বাড়িতে এসে পৌঁছল যখন, মন উঠেছে ক্ষেপে। অসুস্থ তো ছিলই, তার উপর রোদে ঝলসানো চোখ-মুখ দিয়ে আগুন যেন ছুটে বেরোচ্ছে। সিঁড়ির অগনতি ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠতে রক্তও যেন ধাপে ধাপে মাথায় চড়ছিল।

স্টুডিয়োয় পৌঁছে গায়ের জামা পায়ের জুতো এক এক করে খুলে নিয়ে এধার-ওধার ছুঁড়েই পৌঁছে দিল, যেন সেগুলিও তপ্ত মনের বিক্ষোভ।

সনাতন একধারে মাটি বানাচ্ছিল, নিঃশব্দে চেয়ে দেখল। সে ভাস্করকে এতশীঘ্র ফিরতে দেখে বিস্মিত, কিন্তু তার বেশ ছাড়বার পদ্ধতি দেখে মনে মনে আতঙ্কিত হোল। ভাস্করকে দেখলে আজকাল ভয় লাগে—কথাবার্তা কর্কশ, মেজাজের নিশ্চয়তা নেই, বর্ণ কালো, চোখ ঢুকেছে কোটরে। হঠাৎ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে জলজলে চোখে তাকায় কিংবা বকতে থাকে, তখন সেই প্রায়-কদাকার চেহারা দেখতে অশ্বস্তি লাগে, চোখের কোনাও আর্দ্র হয়ে আসে।

জামা, জুতো, গেঞ্জি—সব এক-এক-করে ছুঁড়ে রাখবার পর ভাস্কর মুহূর্তের জন্য নিবৃত্ত হয়ে থামল। স্টুডিয়োর চারদিকে একবার তাকাল —[illegible]

গুলির টিটকারি। সেসব দেখতে দেখতে চোখদুটো তার আটকে গেল ব্রঞ্জের সেই বুদ্ধমূর্তিটায়।

সনাতন কখন এনে তেপায়ার পর বসিয়ে রেখেছিল, গলায় একটা মালাও ঝুলছে তার। ভাস্কর বুদ্ধের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল।

সনাতন মুখ নামিয়ে ব্যস্ত হয়ে মাটি বানাতে থাকে।

তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাস্করের চিত্ত হঠাৎ জ্বলে উঠল—ওই বৃদ্ধই যেন সব লাঞ্ছনার মূল। তাছাড়া, মাটি বানাতে আরও বেশী শক্তির দরকার। লোচন মাটি বানায়। ভাস্কর ক্রোধ চাপবার কোনরকম চেষ্টা না করে ঝাঁজিয়ে উঠল—'দোসরটি কোথায়? নিদ্রা দিচ্ছেন?'

সনাতন নতমুখে কাজ করতে লাগল। সে যে কিছু শুনতে পেয়েছে মনে হোল না।

'এসব নতুন চাল ছাড়তে হবে বুঝলি? এই বোবা সেজে থাকা!'

নতুন হোক পুরানো হোক সনাতনের চাল ছাড়বার লক্ষণ ছিল না।

ভাস্কর লাফিয়ে উঠল—'হারামজাদা, লাথি মেরে এক একটাকে দূর করব আজ। কথা শুনতে পাও না, কেমন!'

সনাতন চমকে উঠে তাকাল। তার শত-হলেও এ সম্বোধন ভাবনার অতীত ছিল। তারপর উত্তাপহীন শান্তকণ্ঠে বলল—'বলো।'

'কোথায় লোচন?'

সনাতন তেমন স্বরেই জবাব দিল—'দূর হয়ে গেছে। তোমার বলার অপেক্ষা রাখেনি।'

'মানে?'

'খুবই সহজ। আর আসবে না। যে যায় সে তো আর আসে না।'

ভাস্কর একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

সকাল থেকে, আর দেখতে পাইনি। শেষে বাড়ির সর্বত্র খুঁজে খুঁজে দেখলাম, যেখানকার যা ঠিক তেমনি পড়ে আছে। কেবল তার কাপড়, গামছা আর কাঁথার পুঁটলিটা নেই। ভয় পেয়েছিল, কাউকে না বলে চলে গেছে।'

ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে গেল।

সনাতন আবার কাজে হাত দিল। সে আপন মনে বলতে লাগল—'ভেবেছিল তাকে বোধ হয় কেউ বাধা দেবে। হায়রে পাগল!'

সনাতন কাজ করে চলতে লাগল। নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে তার কাদাছেনার পুচপুচ শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠে। সে যেন নেপথ্য ভাগ্যের ক্রুরহাসির মতো।

ভাস্কর কিছুক্ষণ দম ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর গলাটা যতদূর সম্ভব কোমল করে বলল—'এখনি আসছি। মূর্তিটাকে ভিজিয়ে রাখো।'

সনাতনের সেই দোসরহীন একলা উদাস চেহারা ভাস্কর যেন সইতে পারল না। আর একজনের স্মৃতিও তার মনের মধ্যে বড় জলজল করে ফুটে উঠছিল—মমতার। সে অনেক কথা কাটাকাটির পরেই তবে লোচনকে ধরে এনে বহাল করেছিল। ভাস্করের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হবে এ চিন্তা সে কোনমতে সইতে পারেনি। মমতা গিয়েছিল। যাক, এবার লোচনও তাহলে গেল!

২০

পশ্চিমে হাওয়ার গুণে কিনা বলা যায় না, মমতা শুকিয়ে উঠছে।

কিন্তু যে-অসুখে মমতা প্রতিদিন শুকিয়ে উঠছে উদয় তার নাগাল পেল না।

মমতার সদাশ্রান্ত চোখের নীচে কালি, মুখের উপর পাণ্ডুর একটি কৃশতা। এতদিন সে সকল রকম বাক্যালাপ থেকে দূরে সরে ছিল। অল্প কদিন হোল আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছে। এমন কি ভুবনবাবুর তাড়না এড়াতে দুবেলা কিছুক্ষণ করে বেড়াতে যাচ্ছে।

বিকালে বেড়িয়ে ফিরছিল, মালতী সঙ্গে। উদয় ভুবনবাবুর সঙ্গ রাখতে পিছিয়ে পড়েছিল।

মালতী গেট পেরিয়ে উদ্যানে পৌছুলে সুমুখের দিক চেয়ে বলল— 'বাস্তবিক উদয়বাবুর এই বাড়িখানা থেকে নজর ফেরে না। এ বাড়ির যে গিন্নী হবে ভাগ্যবতী সে!'

বলে মালতী সকৌতুকে মমতার দিকে তাকাল, কিন্তু মমতার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে সামনে চেয়ে থমকে গেল।

বসুমতী এদিকে চেয়ে দুয়ারের পর্দা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এদের সঙ্গে তিনি কোথাও বের হতেন না। চিরকালই স্বল্পভাষী! ইদানীং তাঁর কথাবার্তা আরও কম হয়ে উঠেছে।

মালতী চুপ করল। শুধু অপ্রতিভ-ভাবটা গোপন করতে নিম্নস্বরে বলল—'হায় মাসীমা! একলা বাড়ি আগলাচ্ছেন। এতটা দূর ছুটে আসা যে ওঁর কাছে কি নিরর্থক, তা ওঁকে এমনভাবে না দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝা যায় না'।

মমতা এ-উক্তিরও জবাব দিল না।

মালতী সিঁড়িতে পৌঁছে সরে পড়ল। মমতারও মায়ের সামনে পড়ে

মেয়ের সজ্জিত আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বসুমতী বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। সেভাব চেপে বললেন—'গিয়েছিলে সেই, আর এই এলে। সুখেই আছ বলতে হবে।'

মমতা নীরব। আজকাল মাকে কিছু বলা যায় না, বলতে গেলেই রেগে ওঠেন।

বসুমতী বললেন—'কেবল কোন সুবাদে আছ জানিনে। এত সাজ-গোজই বা কিসে আসে তুমি জান।'

মমতা দেখল মায়ের হাতে চিঠি, তাকে চুপ করে থাকতে হোল। যেদিন বাড়ির চিঠি আসে, মা যেন আরও অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

মা বললেন—'কিন্তু ভাল যখন আছ, থাক। কেবল আমাকে তোমরা বাড়ি পাঠিয়ে দাও। সুখে-দুঃখে এতটা বয়স যেখানে কাটল, আমাকে শেষ ক'টা দিন সেখান থেকে ছিঁড়ে ফেল না।'

'মা—'

মা বলতে লাগলেন—'যেদিন থেকে আশ্রম গেল সেদিন থেকেই মন বলেছিল, এবার থেকে বেই বেই করে নাচা সুরু হবে। কি-যে চাও বুঝিনে আমি!'

'শোন মা—'

'কি শুনব! তোমার মন যে কি দেখে মজে আছে, বুঝিনে? আমিও তো বাধ সাধছিনে, বাছা। বড় হয়েছে ভালমন্দ বোঝ—কেন বাধা হব। এই নাও চিঠি, যেমন উত্তর যাবে তেমন আমাকেও কারো সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। তারপর মামা-ভাগ্নী যা ভাল বোঝ করো।' বলে খামের চিঠি তার কোলের উপর ফেলে দিলেন।

মমতা চিঠিখানা কুড়িয়ে নিল, কিন্তু মুখ আড়াল করে হেঁটমুখে

'নাও পড়ো! যাহোক সংবাদটা তো বলো—তাতে আর তাঁদের কিছু বেফাঁস হবে না!'

সহসা মুখ উঁচু করেই মমতা ডাকল—'মা!' অদম্য উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। উদয় আর ভুবনবাবু গেটে ঢুকছেন দেখে, সে মায়ের হাত চেপে ধরে একরকম আকর্ষণ করেই তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল।

তাঁকে বিছানায় বসিয়ে নিজে সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল—'তাকিয়ে দেখ তো মা, কিছুই কি পড়তে পার না?'

মা স্তম্ভিত হয়ে চাইলেন।

মমতা বলল—'হ্যাঁ, আমার মুখের দিকে তাকাও।'

'মমতা!'

'হ্যাঁ, মা। কিছুই কি পড়তে পার না? একবর্ণও নয়।'

তার চোখের পাতা, চিবুক, গণ্ড অশ্রুপ্রবাহে ভাসতে লাগল।

মমতা ক্রমে ক্রমে কথাবার্তা বলায়, এমন কি কদিন বেড়াতে পর্যন্ত যাওয়ায় উদয় আর ভুবনবাবু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তাহলে মমতার আশা হয়তো যত কঠিন ভেবেছিলেন তত কঠিন না-ও হতে পারে। কিন্তু মা ও মেয়েকে অমন হঠাৎ যেতে দেখে উভয়েই চমকে গেলেন।

ভুবনবাবু বৈঠকখানায় চেয়ারে বসে ফিসফিস করলেন—'ব্যাপার কি উদয়?' বেড়াবার ছড়িখানা তুলে নেপথ্যও দেখিয়ে দিলেন।

উদয় শুষ্কমুখে বলল—'জানিনে। দেখলাম তো চিঠি এসেছে।'

ভুবনবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন, অর্থাৎ তিনিও দেখেছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ ধাঁধা থাকল না। কিছু পরে মমতা যখন সেই কাপড়েই ঘরে এসে উপস্থিত হোল তখন উভয়েই তাকে দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন। এত অল্প সময়ে মানুষের চেহারা যে এমন করে বদলে যেতে

শ্রান্ত—সে অনতিপূর্বের ভ্রমণক্লান্তিও নয়, গণ্ড-চিবুকের উপর থেকে অশ্রুর দাগ মোছা হয়েছে বটে কিন্তু সেটা অন্যমনস্ক লোকের চোখেও ধরা পড়ে।

মমতা এসে কাছে দাঁড়াল। দুজনের কেউ তার মুখের দিকে চাইতে পারলেন না।

মমতা শান্ত-স্বরে বলল—'আমাকে যেতে হবে।' তার গলা ভেজা ভেজা।

ভুবনবাবু চমকে বললেন—'এঁ্যা, এখন আবার সেই টিলায়! কিছু ফেলে এসেছিস নাকি?'

'আমাদের বাড়ি যেতে হবে মামা।'

'বাড়ি! কেন, কি হয়েছে-শুনি?'

'চিঠি পেলাম—না না, মধ্যে আর কদিন মোটে বাকী!'

ভুবনবাবু চেয়ারের মধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—'কিন্তু কিসের—সে-তো বলবি?'

মমতা বলতে গিয়ে উদয়ের দিকে চেয়ে আবার চুপ করল।

মামা বললেন—'বল!'

'আশ্রমের বর্ষোৎসব।'

'বর্ষোৎসব!' ভুবনবাবু ধমকে উঠলেন—'তাতে তোর কি, তুই তার কি-ধার ধারিস! আর কি-তুই তাদের মাইনে নিস?'

মমতা জবাব দিল না।

ভুবনবাবু বললেন—'চিঠিই বা দিতে গেল কে, কে আমাদের এমন সুহৃদ শুনি?'

'উর্মিদি। তাছাড়া কতদিন তাঁকে—না না, আমাদের যে যেতেই হবে মামা।'

ভুবনবাবু বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন। শেষে বললেন—'বেশ,

যাও। কিন্তু এরপর আর আমার সঙ্গে মা-মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই, বলে দিচ্ছি।'

মমতা চুপ করে থাকলে ভুবনবাবু ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি আরও শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিলেন, উদয় তাকে বাধা দিয়ে টেনে টেনে হাসতে লাগল—'মন-প্রাণ খারাপ থাকলে কি-যে আপনি বলেন তার ঠিক নেই। না হয়, ওঁরা কদিন ঘুরেই আসুন না!'

'এ্যাঁ, যাবে। তুমি বলছ উদয়?'

'দোষ কি। উৎসব তো বারোমাসই লেগে থাকবে না!'

উদয় বুঝছিল একবারে আরও টানতে গেলে এবার ছিঁড়ে যাবে। তাছাড়া তাকেও উৎসবে উপস্থিত হতে পত্রে পত্রে যতীবন্ধু হাঁপিয়ে তুলেছিলেন। সে সংবাদ এরা জানতেন না।

প্রস্তাব ভুবনবাবুর মনঃপুত হোল না। ক্ষুন্নস্বরে বললেন—'কিন্তু শরীর কারো ফিরল না। তাছাড়া সেখানে গিয়ে তো একটা কাজের লোক পর্যন্ত পাব না।'

উদয় হাসল, বলল—'আচ্ছা, সে-ভার আমার।'

ভুবনবাবু বললেন—'যা ভাল বোঝ তোমরা কর। আমাকে আর এর মধ্যে টেন না—বৃদ্ধ হয়েছি।' বলে যেন উদয় ও মমতাকেই একান্তে পরামর্শ করবার সুযোগ দিয়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে থাকল শুধু উদয় ও মমতা। কিন্তু কেউ কারও দিকে চোখ তুলে চাইল না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলে গেলে, মমতা বলল—'আপনি আমাদের উপকার করেছেন।'

উদয় করুণ চোখে তাকাল—উপকার! এখনও কি বিন্দুমাত্র আপন বলে ভাববে না?

হয়তো যাবার আগে আপনাকে আমাদের ধন্যবাদও দেওয়া দরকার।'

উদয় চোখ নামিয়ে নিল। বলল—'কিন্তু গাড়ি তো সেই রাতে। ভাবছি, না হয় আমিও কদিন ঘুরে আসব।'

মমতা সন্দিগ্ধভাবে তাকাল। উদয় বলল—'আমারও তো দেশ!'

মমতা সে কথা কানে তুলল না। সে যেতে যেতে বলল—'গাড়ির সময় তো জানিনে। কিন্তু আজই আমাদের রওনা হতে হবে।'

২১

মমতা আগে কোনদিন বিদেশে বড় যায়নি। তাই সারাপথ আসতে আসতে ক্ষুদ্র-প্রবাসকেও দীর্ঘ প্রবাসের মতো লাগছিল—যেন কতদিন পরে দূরদেশ থেকে ঘরে ফিরছে। ফিরে কি দেখবে, কোন বিস্ময় যে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে—এ নিয়ে মনে শংকার শেষ ছিল না। তেমন এতদিন পরে তাঁকে দেখবার সম্ভাবনায় মনে মনে ব্যাকুলতারও অন্ত ছিল না। এতদিনেও সেই তিক্ততা কি মুছে যায়নি? নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে তো অশ্রুধোয়া আকাশের মতো কোন মালিন্য নেই। সে যে নতুন করে পাবার আগ্রহেই উন্মুখভাবে ছুটে চলেছে।

কিন্তু শহরে পৌঁছে উদয় এবার প্রায় ঘরের-ছেলে হয়ে উঠল। দেখা-শোনায় কোনপ্রকারে একমুহূর্ত ফাঁক দিল না। কিছুদিনের অব্যবহারে বাড়ির পাশে জঙ্গল হয়েছিল, সাফ করতে লোক লাগিয়ে বাইরে গেলে পথ থেকেই ফিরে এল—ভাগ্য সুপ্রসন্ন, রান্নার লোকটিও

হাজির। লোকটা কাজের চেষ্টায় পথে পথে ঘুরছিল, সে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে।

ভিতরে গিয়ে বসুমতীকে সংবাদ দিলে তিনি আপত্তি করতে লাগলেন—'আমার লোক চাইনে। হেঁসেল কাউকে দিতে পারব না।'

উদয় দ্বিধায় পড়ে গেল।

ভুবনবাবু বললেন—'তোর আচার থামা দেখি। মমতা!'

মমতা ঘরে পড়ছিল, মামার ডাকে যাওয়া হোল না।

মামা বললেন—'দুদিন জুড়োতে গিয়েছিলাম, সে তো দিলে না। এখন কি এই বেতো শরীরে আমি দেখতে যাব, সে-লোকে হেঁসেল চলবে কিনা?'

মমতা রুষ্টমুখে বলল—'যাচ্ছি।' তারপর বারান্দায় এসে লোক দেখে চমকে উঠল—'লোচন!'

'দিদিমণি!'

'চুপ। একটু দাঁড়াও লোচন!' বলে মমতা ত্রস্তপদে ভিতরে চলে গেল।

লোচন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ ক্রমেই বাড়াতে লাগল।

মমতা দেখল—উদয় আর ভুবনবাবু ইতিমধ্যেই গল্পে জমেছেন, বসুমতীও রান্নাঘরে। সে বোনবার উল-কাঁটা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে উপস্থিত হোল। লোচন বলল—'এক গেলাস জল দিদিমণি।'

মমতা জল নিয়ে ফিরে বলল—'তোমার এসব পোটলা-পুঁটলি যে? ওখানের সংবাদ কি লোচন?'

'বলছি।' লোচন আগে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নি[illegible]।

কিছুক্ষণ পরে। মমতা একাগ্রচিত্তে বুনতে বুনতে কাঁটা থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল। সমস্ত শোনা হলেও তেমনই বসে রইল, মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হোল না।

লোচনও সমস্ত বলে কিছুক্ষণ থেমে থাকল। ভেবে দেখল বলতে কোথাও বাদ পড়েছে কিনা। তারপর বলল—'আজ দুদিন তাই কাজের চেষ্টায় পথে পথে ঘুরছি দিদিমণি। কে জানত যে এমন করে দেখা হয়ে যাবে! মরণ পালিয়েও মরতে বসেছিলাম, এবার বাঁচব।'

মমতা আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বলল—'কিন্তু তিনি তো তোমাকে জবাব দেননি, লোচন। তুমি ছেড়ে যাবে কেন?'

'না, তা দেননি।' লোচন একটু ভেবে বলল—'কিন্তু কে কাকে জবাব দেবে দিদিমণি? আত্ম-কুটুম তাকেই তো সব জবাব দিয়ে গেছে। সময় খারাপ পড়লে ছেড়ে আসতেই হয়।'

'সে কি উচিত, লোচন?

লোচন কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাথা নাড়ল—'তা জানিনে। কিন্তু যেখানে তুমিই থাকলে না, সেখানে আর অন্যের কথা বল কেন? তুমি অনেক লেখাপড়া জান, সেখানে থাকলে আরও দুর্গতি বুঝেছিলে বলেই না আর যাওনি!'

মমতা ব্যথিত মুখে চেয়ে রইল।

'না না, তুমিই জিতেছ দিদিমণি। আমরা আগে বুঝিনি। তাই এই দশা।' মমতা তবুও চেয়ে আছে দেখে লোচন বলল—'অমন লোকের কথায় থাকতে আছে? অনবরত গালি-গালাজ, তাতে রোগী -রক্ত পড়ে। সারাদিন মনিষ্যিটার মুখ দেখার জো নেই। আর রাত হলে যারা দুপ-দাপ করে ঘুরে বেড়ান—দিদিমণির কি অসুখ?'

মমতা ঠোঁট চেপে ঘাড় নাড়াল।

লোচন বলল—'অসুখ না হলেই ভাল।' তারপর তার বিবর্ণ মুখের [illegible] সহানুভূতি জানিয়ে বলল—'শুনে তো তোমার দুঃখ সবারই

কথা, দিদিমণি। সেখানে তোমার যাওয়া-আসা যত্ন-আত্তি তো কম ছিল না।'

মমতা আচ্ছন্নের মতো থেকে বলল—'কেউ না আসুন, তোমাদের দিদিসাহেব তো আসেন? তাঁকে তো আসতেই হয়?'

'একটু কমকমই। দানা ফুরলে লক্ষ্মীর পায়রা কদিন আসে বলো।'

মমতা চুপ করল।

পুরানো মনিবের জন্য সহানুভূতির যা অবশিষ্ট ছিল, সেটা এতক্ষণে বোধ হয় তাপে তাপে বাষ্পাকারে দেখা দিচ্ছিল। তাই লোচন একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত করে বলল—'এখন আর কোন উপায় নেই। কেবল সোনা-দা বলে'—লোচন মমতার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'কি বলে সে?'

'তোমার কথা বলে—তুমি যদি যাও।'

'তা কি হয়!' মমতার কণ্ঠ দিয়ে অজানিতে বের হয়ে গেল। অথচ সে যাবার জন্যেই মনে মনে প্রস্তুতও হয়েছিল।

লোচন বলল—'আমিও তো তাই বলি। বলি যে, এতদিন দিদিমণি তাহলে আসতেন। কিন্তু সোনা-দার ওই এক কথা। আসলে বুড়ো অথর্ব হয়েছে কিনা—বুদ্ধিটাই একটু ঘোলাটে।'

মমতা মুখ নামিয়ে বুনতে লাগল।

লোচন একটু থেমে বলল—'আচ্ছা দিদিমণি, এ-দাদাবাবুর অবস্থা খুব ভাল—তাই না?'

'কার?' মমতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, কিন্তু তার মুখে আরক্ত আভা পড়ল।

'এই নতুন দাদাবাবুর।'

মমতাকে তবুও বিস্মিত এবং আরক্ত দেখে লোচন ঘাড় নেড়ে জানাল যে তিনি নিজেই আসছেন।

উদয় পরপরই ভিতর থেকে বারান্দায় এল। সে বাড়ি ফিরছে। মমতা মুখ নামিয়ে বুনতে লাগল।

উদয় বুঝল, তাকে দেখে কথা বন্ধ হোল। সে কর্মরতার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল—'তাহলে রান্নার লোক পছন্দ হয়েছে, দেখছি।' সিঁড়ির দিকে দু-এক পা গিয়ে বলল—'শুনলাম কাল আশ্রমে যাওয়া [illegible]। গাড়ির ব্যবস্থা করলে কারো আপত্তি আছে?'

মমতার কপাল কুঞ্চিত হলে উদয় বলল—'এই ফেরা হোল। শরীর এখনো সারেনি।'

লোকটার অপরিসীম সহিষ্ণুতায় মমতার ধৈর্য যেন ভাঙার উপক্রম হোল। কিন্তু লোচন থাকায় তার কথান্তরের ইচ্ছা ছিল না। বলল—'আশ্রমে যেতে তো কারো গাড়ি লাগে না। আশ্রমেও আমি রোজই যাব।'

উদয় বলল—'কিন্তু আমি তো রোজের কথা বলছি নে, শুধু কালকের কথা বলছি।'

মমতা বলল—'বেশ।' উদয় এগোতে লাগলে মমতা আবার বলল—'কিন্তু শুধু কালকের জন্যে। তারপর আর এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়—চাইনে।'

'যেমন অভিরুচি।' উদয় চলে গেল।

লোচন কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল—'দিদিমণি কি [illegible] যে ছিল না?'

মমতা মাথা নাড়ল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করল—'কেন?'

'না, তাই বলছি। কাল আশ্রমের উৎসবে খুব জাঁক! দূরের থেকেও অনেকে আসবেন। সোনা-দা তো সারাদিনই স্বপ্ন দেখে।'

'কিসের স্বপ্ন লোচন ?'

'দাদাবাবু যে সেখানে কি খাতির পাবে, টাকাও পাবে। ওই দিন ইস্কুলের মাস্টারমশায়ও মূর্তি নেবেন কিনা! সোনা-দা তো উঠতে বসতে তাই বলে।'

'তাই বলে, লোচন ?'

লোচন একটু ভেবে বলল—'হ্যাঁ, বলে। কিন্তু মূর্তি এখন শেষ হয় তবে তো।'

'শেষ হয়নি বুঝি !'

'সোনা-দা বলে, শেষ হবে। কিন্তু আমি বলি—যিনি শেষ করবেন তাঁর শরীর-গতিক'—

'থাক। তোমার তেল পাঠিয়ে দি, চান করে নাও।'

মমতা উঠে পড়ল, তার আর শোনার সাহস ছিল না। এখন ভালয় ভালয় দেখা হয়ে নিক, তারপর যা শোনবার সে তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনবে।

২২

ভাস্কর বিশ্রামের কথা আর ভাবতে পারে না। সে চব্বিশ-ঘণ্টা স্টুডিয়োয়। দুই চোখে থেকে থেকে ঝাপসা দেখছে, বাহু শ্রান্ত, মেরুদণ্ড ভেঙে আসতে চায়। কিন্তু পরীক্ষা আসন্ন হলে অমনোযোগী ছাত্র যেমন সারাবছরের ভুল ত্রুটি একরাত্রে শুধরে নিতে চায়, তেমন ভাস্করও তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কশাঘাত করে খাটিয়ে চলছে।

হয় আজই তাকে মূর্তির কাজ শেষ করতে হবে, নয় তো কোনদিনই

নয়। দেনাশোধের ওয়াদা যাওয়ায় রমাকান্ত তাগাদা লাগাচ্ছিল। তারপর আজ উষানাথের লোকও এসে জানিয়ে গেছে—'কর্তা পৌছেছেন, মূর্তি নিতে কাল আসবেন। দিনও কাল ভাল।'

ভাস্কর শ্রান্ত হলেও খেটে চলল। একই সাথে দায়মুক্তি ও ঋণ-মুক্তির আশা তাকে উৎসাহ দিতে লাগল। মূর্তির উপর বাটালির কাজ শেষ হয়েছিল, আজ সকাল থেকে সিরিশ ঘষছে এবং মাঝে মাঝে দূরে গিয়ে নিপুণ চোখে যাচাই করছে। এতে তার মেরুদণ্ডও অজানিতে অল্পবেশী আয়েশ পাচ্ছিল।

সনাতন অদূরে দাঁড়িয়ে প্রয়োজন মত জিনিস জোগাচ্ছিল। সে সেদিন থেকে আর কথা বিশেষ বলে না, কিন্তু আজ কিছুক্ষণ বিষণ্নমুখে চেয়ে চেয়ে সভয়ে বলল—'এখন কিছুক্ষণ থাক। আর ক'রো না।'

ভাস্কর ফিরে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করল—'কেন!'

'একদিনে আরও করতে গেলে ভেঙে পড়বে, সইতে পারবে না।'

'কে চায় সইতে। আমি তো চাইনে।' ভাস্কর কাজ করতে করতে বলল—'তোমাদের ওই একটানা ছি-ছিও আর আমি সইতে পারব না। কেবলমাত্র সেইজন্যেই আমাকে শেষ করতে হবে।'

সনাতন একথা দুদিন ধরে অনেক শুনেছিল। কিন্তু ভাস্করকে সে হাতে করে মানুষ করেছিল। তার সেই ভগ্ন শীর্ণ দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনের ভিতরটা পুড়তে লাগল।

ভাস্কর আবার বলল—'তাছাড়া, যমুনা দাদাকে দেওয়া কথা! তা' আমাকে রাখতে হবে না? কাল-পরশু তার টাকা না দিলে মান থাকবে, বাড়ি থাকবে?'

সনাতন ভয়ে ভয়ে বলল—'তোমার অন্য পাওনাও তো আছে,

না হয় তা' থেকে দিও।' ভাস্কর কাল আশ্রমে যে টাকা পাবে সনাতন তাই বোঝাতে গেল।

ভাস্কর পলকের জন্য ক্ষিপ্ত চোখে ফিরে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না। ও সব কালই বটে, কিন্তু সে যে একখানা চিঠির আহ্বানও পায়নি একথা আজ ভৃত্যকে বলতে বাধল। তেমনই কাজ করে চলে শান্ত কণ্ঠে বলল—'অন্ন পাওনা! না, নেই। তোমরা আর থাকতে দিলে কোথায়।'

সনাতনের চেহারা সে দেখতে পেল না। তাই কিছুক্ষণ কেটে গেলে আবার বলল—'কোন কিছুই আর কোন কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত ওই বিলাসস্মৃতিই আমার সহায়—আর ওদের যিনি আদর্শ। যাব একদিন —এই কাজটা মিটে নিক—সরু উকোটা দে।'

সনাতন উকো এগিয়ে দিল।

ভাস্কর বলতে লাগল—'আজ ওরাই আমার বন্ধু, অসময়ের বন্ধু। যারা চলে গেল তারা যাক, যারা আজও রইল তারাই তো আমার আপনার—জল দে।' হাতের উল্টো পিঠে সে চোখদুটোকে বার-বার করে ঘষতে লাগল। আবার চোখে ঝাপসা দেখছে।

সনাতন জল আনলে ভাস্কর টবের পাশে অঞ্জলি করে দাঁড়াল। একটু দাঁড়িয়ে বলল—'কি হোল, ঢাল।'

কিন্তু সনাতনের বিষণ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে তার নজরও নিজের আঙুলকটার উপর আকৃষ্ট হোল। দশটা আঙুলই কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে অনিচ্ছুক সুতোর মতো থর থর করে কাঁপছে।

ভাস্কর একটু হাসল।

সনাতন জল ঢালতে ঢালতে বলল—'দাদাবাবু, আজ ছাড়ান দাও।'

'না না, একথা বলিস নে।'

তুই বুড়ো মানুষ, তুই না হয় যা। সেই সকাল থেকে একভাবে দাঁড়িয়ে আছিস।'

ভাস্করের গলায় একটু স্নেহের আভাস দেখা দিল, আজ অনেকদিন পরে। সনাতন সজল চোখে মুখ ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু গেল না।

ভাস্কর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল, বলল—'আঙুলগুলিই নয়, এতদিন রক্তের প্রত্যেকটা কণাকে কি-ভাবে ছুটিয়ে এনেছি একবার ভাব দেখি। একদিন যারা ছিল তারা নেই, যাদের অদেখা অবধি ভাবতে পারিনি তাদের সঙ্গে জীবনের মতো বিচ্ছেদ হয়ে গেল, তবু তো থামতে পারিনি। আমাকে পৌছতেই হবে উঁচুতে, আরও উঁচুতে শিখরে না চড়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'শাস্তি তো পেয়েছ। আজ ক্ষান্ত দাও।'

শাস্তি তো পেয়েছ! ভাস্কর গরম হোল—'কিছু সফল তো হয়েছি, সেদিনে আর আজকে যে তফাত সেটা তো মানবি!

সনাতন মাথা নাড়তে লাগল।

ভাস্কর বলল—'মাথা নাড়ছিস কি?'

সনাতন থেমে একটু ইতস্তত করে বলল—'মানি।'

'মানি কি?'

সনাতন ভেবে বলল—'তফাত মানি।' সে আরও কিছুক্ষণ থেমে, যেন বলবে কি বলবে না আগে বিচার করে নিয়ে বলল—'যখন এই ভাঙ্গা বাড়ির পড়া ঠেকাতে অষ্টপ্রহর কাজে মেতে থাকে—সেদিনের কথা মনে পড়ে, যখন আগে যাদের ঠাট্টা করে 'বাবু' বলতে আজ তোমাকেও তাদের মধ্যেই দেখি, যখন দেখি তুমি হার মেনে ধন্দ দিয়েছ—তখন মানি বই কি সেদিনে আর আজকে অনেক তফাত।'

সনাতন থামল একটু, বলল—'কিন্তু আমি তো হার মানব না! আজ আমিও—আমরাও অনেক তফাত হয়ে গেছি।'

ভাস্কর আশ্চর্য হোল, এসব কি অশিক্ষিত সনাতনের কথা! সনাতন আজকাল কথাবার্তা বেশী বলে না, সে কি তবে এসব চিন্তাই করছে! বলল—'মিছে বাকস্‌ নে। শেষে নিজের কথায় নিজেই বসে কাঁদবি। তুই কি বাড়ির জন্যে কম করেছিস?'

সনাতন প্রায় করুণের মতো হাসল, বলল—'কিন্তু আর বোধ হয় আমাকে তুমি চাও না। বুড়ো হয়ে গেছি।'

'পাগলামি রাখ।'

'পাগলামি!' সনাতন বলল—'তা বলো। কিন্তু তফাতে যাওনি শুধু আমাকে ফেলে। আজ নতুনের নেশা তোমার কি করেছে দেখেছ?' সনাতন আকুল হয়ে উঠল—'সেদিন আজ কোথায় দাদাবাবু, যেদিন আমাদের অনেক ছিল না কিন্তু অভাবও ছিল না? তোমার স্বাস্থ্য, তোমার আশ্রম, তোমার হাসি, খুকি—কোথায় এরা? যেদিন আমাদের সব ছিল, সবাই এক ছিলাম, তুমি সেদিন থেকে অনেক দূরেই গেছ।'

ভাস্কর আরক্ত হয়ে চেয়ে রইল।

সনাতন থেমে গেল, যেন সে আর কিছু বলবে না বলে স্থির করেছে। কিন্তু ভাস্করের স্বাস্থ্য নিয়ে তার ভয়েরও শেষ ছিল না। ধৈর্যেরও শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। তাই আবার বলল—'দাদাবাবু! মনে কি পড়ে, যেদিন দারিদ্র্যে দেনা তবু শৌখিনদের বায়না এলে ঠাট্টা করে তাদের বলতে বাজারে যেতে? বলতে তুমি বাজারিয়া নও? তোমার মূর্তি বিক্রী হয় না—এই তোমার গর্ব ছিল।' থেমে বলল—'আমাকে

সনাতনের মতিগতি দেখে ভাস্কর নির্বাক হয়ে গেল, মনে মনে গরম হয়েও উঠল। সনাতনের সকল কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু একেবারে সত্যও সব নয়। সে আদর্শকে ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু নবীন [illegible] আদর্শ নিয়ে কাজেও লেগেছিল। অবশ্য সেদিনের সঙ্গে আজকের অনেক তফাত। আজ মূর্তি শেষ হবে, কিন্তু তারা কোথায় যারা একদিন সুরুতেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল!

সনাতন থেমে বলল—'ব্যথা দিলাম তোমায়। কিন্তু আমিও যে আর ভাবতে পারছিনে। তোমাকে ঠাকরুণের কাছ থেকে একতাল সোনার মতো পেয়েছিলাম—সোনা ভেবেই মানুষ করেছিলাম। কিন্তু'—সনাতনের কণ্ঠ যেন হঠাৎ রুদ্ধ হোল।

দুজন কয়েকমুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বলল—'কিন্তু কি?' তার চোখে জলের আভাস, কিন্তু স্বরে বোঝা গেল তার বুকের ভিতর পুড়ে যেন খাক হয়ে উঠছে।

সনাতনের থেমে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে থামতে পারল না। বলল—'বললে কিনা, উঁচুতে চড়ার কথা—কিন্তু আমি যে তোমায় হাঁটা শিখিয়েছিলাম। আমি তো ভুলতে পারিনে, যেপথ যত খাড়া তারপর থেকে পতনও তেমনি মারাত্মক।'

'তা বলে মানুষ উঁচুতে চড়বে না?' ভাস্কর জলতে লাগল।

'কেন চড়বে না! কিন্তু সবদিক বজায় রেখে, অবস্থা বুঝে। কিন্তু আমি বলি, নাইবা চড়লে অত উঁচুতে! মানুষের বাস তো ভগবান মাটির পরেই বলে দিয়েছিলেন?'

ভাস্কর ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংবরণ করল, বলল—'যাক, তা নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। কিন্তু আপনি আমার পতনটা

[illegible] করতে লাগল।

'নিজে কি দেখতে পাওনা যে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে! তোমার চোখ, মুখ, স্বাস্থ্য, চেহারা—'

'জ্বালাতন !!'

'পাপের চেহারা দেখতে তো আয়না লাগে না, দাদাবাবু।'

'দেখাচ্ছি,' বলে কি করছে ভাববার আগেই ভাস্কর সহসা সনাতনকে মেরে বসল। পরমুহূর্তে যেন চমক ভাঙায় সে ছুটে বেরিয়ে গেল। পতন যে কতখানি নামতে পারে তা বোধ হয় তার নিজের কাছেও আর গোপন রইল না।

বৃদ্ধ আঘাত পেয়ে বসে পড়ল। ব্যথিতেরও বেশী বিহ্বল হোল সে। গাল থেকে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিয়ে প্রথমেই যেদিকে চাইল সে দেহের কোন ব্যথার স্থান নয়, সে দেয়ালের সেই তৈলচিত্রগুলি। কিন্তু তার চোখে আর জল ছিল না। স্থির পায়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলল। ভাস্কর তোয়ালেখানা ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছিল সেখানাকে তুলে রাখল। কাঠি, উকো, টব, সব সাজিয়ে রাখল যথাস্থানে। তারপর মৃদুপায়ে ভিতরে চলে গেল।

ভাস্কর নিজের ঘরে গিয়ে জানলায় বসে একদৃষ্টে দূরে চেয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন সনাতন এসে প্রবেশ করল, সে তার পায়ের শব্দে বুঝতে পারলেও তাকাতে পারল না। তেমন নিশ্চল হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

সনাতন খানিক অপেক্ষা করল। তারপর ঘরের মধ্যে টুক-টাক নানা শব্দে বোঝা গেল, সে ঘর গুছোচ্ছে। দুজনেই স্টুডিয়োতে আটকা থাকায় আজ ঘরদোর সব অগোছান পড়ে ছিল।

গোছান সারা হোল। সনাতন এসে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে

ভাস্কর তার অপেক্ষা করা বুঝছিল, ডাকল—'সনাতন!' সে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও তার গলার স্বর ভেজা।

সনাতন বুঝল, সে নিঃশব্দে কাঁদছে। বলল—'তোমার রুটি এখন আনি? খাওনি সকাল থেকে।'

'থাক। তুই এদিকে আয়, শোন।' ভাস্করের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

'থাক কেন। বেলা আরও বাড়লে তোমার পথ্য সহ্য হয় না, ডাক্তারেরও নিষেধ আছে।'

ভাস্কর বসে রইল।

সনাতন খাবার এনে দিলে সে আর বিশেষ দ্বিরুক্তি করল না। মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে খেতে বসল। চিরকালের অভ্যাসমত সনাতন আজও অদূরে দাঁড়িয়ে রইল। খেতে ভাস্করের রুচি ছিল না। কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে উঠে পড়লে শুনতে পেল, বৃদ্ধের ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস চাপা সত্ত্বেও গোপন থাকল না। সে যে আর পথ্যটুকুও আগের মতো খেতে পারে না, এ নিয়ে বৃদ্ধের ক্ষোভের অন্ত নেই।

বিশ্রাম নেবার ছলে কিছুক্ষণ শুয়ে বসে আড়ালে কাটিয়ে ভাস্কর উদ্গত রোদন সংবরণ করবার চেষ্টা করল। তারপর আবার স্টুডিয়োয় এসে দেখতে পেল, সনাতন আগে থেকেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল—'একি, এখনো খাওনি সনাতন?'

কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময় জমা হয়ে ছিল। সে দেখতে পেল, একটা ছোট পুঁটলিতে বৃদ্ধের টুকি নাকি কয়েকটা জিনিস বাঁধা, সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণখানাও দেখা যাচ্ছে পুঁটলির কোনা দিয়ে।

সনাতন সজল চোখে হাত জুড়ে বলল—'আমাকে মাপ করো দাদাবাবু।'

ভাস্কর যেন পাথর হয়ে গেল।

সনাতন বলল—'আর নয়। অন্ন যতদিন মাপা ছিল, খেয়েছি এবার ছুটি দাও, জীবনের আর কটা দিনই বা আছে।'

'একটু কথা বলব। শুনবে সনাতন?'

সনাতন বিষণ্ণভাবে হাসল, কিন্তু মাথা নাড়াল—না। একটু অপেক্ষা করে বলল—'কিন্তু আজ যাবার সময় আমি একটা কথা বলব তোমায়।' বৃদ্ধ এতক্ষণে হাতের পিছনে চোখ মুছল, বলল—'আমি মাত্র চাকর, আমাকে মারো তাড়াও যা-খুশী তোমার করো। কিন্তু এসব যার জন্যে একদিন সেও বোধহয় ছেড়ে যাবে তোমায়—না হলে কি এ-খোঁয়ার তোমার করে! তুমি সেদিন কিন্তু এই বাস্তুর দিকে চেয়ো—তুমি তো জান না দাদাবাবু, এ কতবড় পুণ্যের সংসার ছিল!'

ভাস্কর অধীরভাবে বলে উঠল—'সেকথা শুনব পরে। আগে শুনি কোথায় যাবে!'

'কোথায় যাব!' বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হেসে পুঁটলিটাকে তুলে নিল, বলল—'যা নিজেই জানিনে, তা আর তোমাকে বলব কি।'

'সনাতন!' ভাস্কর এগিয়ে এল—'অন্তত দুটি খেয়ে যাও।'

সনাতন তার জবাব দিল না। তারপর বালক-বয়সে একদিন যে-সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিল, আজ বার্ধক্যের সীমানায় সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। দাঁড়াল না, আর ফিরেও চাইল না।

বিলীয়মান মূর্তিটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর সহসা যেন চমক ভাঙায় ছুটে গেল স্টুডিয়োতে। এক এক করে দেখতে লাগল—এই যে আমার মূর্তিসংগ্রহ, এই যে আমার পুঁথির রাশি, ওই যে আমার বিলাসমূর্তিরাও

—আমার সবই অটুট আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যেন ভাবতে চাইল, তার তো কোন অস্বস্তি নেই।

কিন্তু আজন্ম যাকে নিঃশ্বাস-বায়ুর মতো সঙ্গে পেয়েছিল তার শূন্যতা বেশীক্ষণ ভরাট লাগল না। এমন সময় সেই বৃদ্ধমূর্তি [illegible] পড়ায় মন আবার ক্ষেপে গেল, চোখ উঠল জ্বলে, সহসা সেই দুপুর রোদেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

২৩

চারদিকে চোখ ঝলসানো রোদ, আগুনের মতো হলকা বইছিল গা পুড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু লালকুঠির খসখস দিয়ে ঢাকা বারান্দায় স্নিগ্ধ শীতল ছায়া। চাপরাসীরা বারে বারে জল দিয়ে খসখসগুলি ভিজিয়ে রাখে। ভাস্কর একটা দাহপূর্ণ হলকার মতো সেখানে এসে উপস্থিত হোল। হলঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেল কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর, সে উচ্ছল কণ্ঠে আবৃত্তি করছে—'আমি, আমি, আমি—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হ'ল সে।" —বাঃ, বহুত আচ্ছা!'

বলে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। একটা মোটা গলার হাসিও সেই

দরজার দিকে নজর পড়ায় কৃষ্ণা চমকে হাসি থামাল, পলকে
টেবিলে ফেলে অসংবৃত বেশভূষা সামলে নিল, তবুও আর
ল না। ভাস্কর যে কোনমতেই আর এ-বাড়িতে আসতে
তখানি সে ভাবতে পারেনি।

র রোদে পোড়া ছায়ার মতো চৌকাঠ ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে
তার শুষ্ক মুখ, তীব্র চাহনি, প্রমত্ত চেহারা—অপলক দৃষ্টি
রে স্থিরনিবদ্ধ। কৃষ্ণার মনে হোল সেই নিষ্পন্দমূর্তি যেন
বিভ্রম, প্রহেলিকা।

। সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ে গরগর করতে লাগল।

সেই নিস্তব্ধ বোবামূর্তি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ধীরে
ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

াস বলল—'নমস্কার!' এবং কৃষ্ণা অস্ফুটে পরিহাস করল—
মানিয়েছে আমাদের শিল্পীকে।'

র কোনটারই জবাব দিল না, চোখের দৃষ্টিও সরিয়ে নিল না।
াখিল পায়ে কৃষ্ণার অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়াল।

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে বলল—'আপনার দরকার কি খুব

। একটা কথা আজই স্থির হওয়া চাই।'

র ঈষৎ হেসে রূঢ়তাকে কোমল করতে গেল। কিন্তু সেই হাসি
ষ্ণার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সে বলল—'তবে পরে আসবেন।
য় নেই।'

লে সময় করতে হবে।' ভাস্করের কণ্ঠস্বর চাপা, কিন্তু জেদী।
চমকে উঠে তার দিকে তাকাল, তাকিয়ে দেখল সুরদাসকেও
থাচ্ছে না। সে মনোভাব দমন করে সহসা চপলভাবে হাসতে

চাইল—'ওহো, আপনাকে বলা হয়নি বুঝি। ঠিক হয়েছে, সুরদাসবাবু আমাদের সঙ্গে লালকুঠিতে থাকবেন, ভাল হয়নি?'

ভাস্কর কৃষ্ণার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরাল না।

কৃষ্ণা বিব্রত হোল। মাথা দুলিয়ে হাসতে চাইল—'বাঃ রে, আপনি বসছেন না কেন! ...ওঁকেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন। তাই না সুরদাসবাবু?'

'হ্যাঁ।' সুরদাস বলল—'এঁদের, বিশেষত এঁর ঋণ জীবনে কোনদিন শোধ করতে পারব বলে মনে করিনে।'

ভাস্কর শ্লেষ করল—'মনে করেন না নাকি!'

কৃষ্ণা মাথা দুলিয়ে উত্তর দিল—'আর কিছু হতে পারত না কিনা! গেজেটেড্ অফিসার, মেস-বোর্ডিঙে থাকা অভ্যাস নেই, অথচ হঠাৎ এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। কতদিন থাকতে হবে ঠিক নেই।'

সুরদাস তাকে শুধরে দিয়ে বলতে গেল—'না না, বদলি শুধু সাময়িক ভাবে—'

কৃষ্ণা সহসা মুখ ফিরিয়ে অনুযোগ করল—'আপনি কেন সব কথায় থাকবেন বলুন তো?' তার চোখ-মুখ অভিমানে ছলছলিয়ে এল।

ভাস্করের অন্তর্দেশ পুড়তে লাগল। সে সুরদাসকে বলল—'ওঃ, সাময়িক ভাবে। তাহলে এ বিড়ম্বনা বোধহয় আপনাকে বেশীদিন পোহাতে হবে না?'

সুরদাস বলল—'বছরখানেক লাগতে পারে।'

'এ-ক বছর!' ভাস্করের ঈর্ষাপীড়িত অন্তর যেন সেই কণ্ঠস্বরে নগ্ন হয়ে ধরা দিল।

সুরদাস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, বলল—'হ্যাঁ। উপরে লিখলে হয়তো আরো কিছুদিন থাকা অসম্ভব নয়!'

'বোধকরি উপরেই লিখবেন?'

কৃষ্ণা এতক্ষণ শুনছিল, হঠাৎ বলে উঠল—'তেমনই তো ঠিক হয়েছে'।' সে যেন এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল।

ঈর্ষা এবং পতন ভাস্করকে অতি দ্রুত গিলতে লাগল। তাই তার সুরদাসকে বলতে বাধল না—'তাহলে জিতেছেন স্বীকার করি। নয়তো ভাড়া দিয়ে এমন বাড়ি, এমন সব সুযোগ সুবিধে জোগাড় করতে ফতুর হয়ে যেতেন।'

সুরদাসের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে গেল। কিন্তু কৃষ্ণা এবার আশ্বস্ত হোল, সে বলল—'ফতুর! কারো কারো পক্ষে তাই হোত বটে, কিন্তু সবাইকে তো হাতে খেটে খেতে হয় না, ভাস্করবাবু!' সে সুরদাসের দিকে ফিরে বলল—'রায়পুর পরগনটার ষোল আনাই আপনাদের না?'

সুরদাস ঘাড় নাড়ল।

ভাস্কর মলিন হয়ে গেল। যে-ব্যক্তি একাধারে গায়ক হাকিম জমিদার তার পাশে নিজেকে দাঁড় করাতে গিয়ে একদিন তারও যে কিছু ছিল একথা মনে পড়ল না। সে ক্রোধে মুখ কালো করে কৃষ্ণাকে বলে উঠল—'ওঃ, তাই আর আমার দরকার নেই! শিল্প ভাস্কর্য সব বাসী হয়ে গেল! কিন্তু মূর্তিগুলি শেষ হবে কবে, শুনতে পারি?'

কিন্তু কৃষ্ণা আর ভীত হোল না। এরপর অবস্থার লাগাম ধরা কিংবা ছাড়া তার খেলার বস্তু। সে যেন ঘোট-কথা গুছিয়ে আনতে সওয়াল করল—'কি বলতে চান?'

ভাস্কর জ্বলে উঠল—'কি বলতে চাই জানো না? না, লোকের সামনে সাধু সাজা চাই?'

কৃষ্ণা ক্রোধ দেখিয়েও চেপে বলল—'একথার জবাব আমি দেব না।'

'দিলে গায়ে জড়াবে, নয়?'

কৃষ্ণা বলল—'কিন্তু এটা সভ্যলোকের বাড়ি, এবং—'

'সভ্য! ... ঠক, বঞ্চক, মিথ্যেবাদী!'

তবুও কৃষ্ণার সহিষ্ণুতা একবিন্দু টলল না। বরঞ্চ সে তেমনই শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে লাগল দেখে ভাস্কর ঠাণ্ডা হয়ে এল। কৃষ্ণা বলল—'এবং আপনাকে একটা কথা জানান দরকার। আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তার শতাংশও সত্য হলে কোন মহিলারই আর আপনার সামনে যাওয়া উচিত নয়। আপনাকে কুঠিতে আসতে নিষেধ করাও আগেই উচিত ছিল।'

এই আবছা ইঙ্গিত ভাস্করের পর মন্ত্রের মতো কাজ করল। তার মাথাও খানিক নুয়ে এল।

কৃষ্ণা বলল—'আর কখনো কুঠিতে ঢুকে হল্লা করার সাহস করবেন না, যান। দেখেছেন, আপনার চেঁচামেচিতে বেয়ারা বাবুর্চিও অবাক হয়ে ছুটে এসেচে!'

দরজার পাশে কয়েকজন বেয়ারা বাবুর্চি উঁকি মারছিল। পাচু সবার আগে। ভাস্কর নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলল—'তবে কেন এতদিন আমায় মিছেমিছি ঘোরালেন, অতগুলি মূর্তিতেই বা হাত দেওয়ালেন? আমার সবই যে ওলট-পালট হয়ে গেল!'

কৃষ্ণা সেকথার জবাব দিল না। সে সুরদাসকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—'আপনি হয়তো অবাক হয়ে গেছেন। কিন্তু এদেশে কতরকমের মহাপুরুষ যে আছেন যদি চেনেন তো ভয় পেয়ে যাবেন। এরা পরকেই শুধু ঠকায় তা নয়, নিজেদের পরিজনকেও গ্রাস করতে ছাড়ে না।'

সুরদাস রুমাল নিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

কৃষ্ণা বলতে লাগল—'হিরো, শিল্পী, গুণী! ভাগ্যি সব ধাঁধাই গোলকধাঁধা নয়, তাই চোরাবালির পর ঘর-বাঁধার মতো যাদের কাঁধে

য়া প্রভু সেজে থাকেন, একদিন তারাই সব ফাঁস করে দেয়। সেই
বো মানুষের চেহারা কখনো দেখেছেন, সুরদাসবাবু?'

সুরদাস সব কথা বুঝল না। কিন্তু যাকে শোনাবার জন্য কৃষ্ণার
লা তার কাছে এর বিন্দু-বিসর্গও অস্পষ্ট থাকল না—না শব্দের অর্থ, না
র কটুতা। ভাস্কর অল্প কিছুক্ষণ আনত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটা
ঢোক গিলে মুখ তুলল, বলল—'আমি, আমি এখন যাই।'

'অনেক আগেই উচিত ছিল।' কৃষ্ণা বলল।

ভাস্কর শ্রান্তভাবে হাত তুলে দুজনকেই একে একে নমস্কার করল।
তারপর দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে পাঁচুর দিকে চেয়ে একবার দাঁড়াল।

পাঁচুর চোখে জল, সে ঈষৎ আনত হয়ে সেলাম করল। বলল—'বাবু,
আপনি আর এখানে আসবেন না।'

ভাস্কর সহসা মুখ নামিয়ে নাকে কোঁচা চাপতে চাপতে পথের
দিকে এগিয়ে গেল—পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা, মাথাটা একটু সামনের
দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

২৪

সনাতনের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল—'ভগবান!'

সে সারারাত ধর্মশালায় দুশ্চিন্তা ও ঝড়ের শব্দে বসে কাটিয়েছিল।
শেষে স্থির করেছিল ভাস্করের যা মনের ইচ্ছা তাই করবে, অর্থাৎ আর
কোথাও চলে যাবে। যশোহরের অখ্যাত গ্রামে ষাট বছরের ছেড়ে আসা
কুটীরখানাও তার অস্পষ্ট করে মনে পড়েছিল। কেবল স্থির করেছিল,
যখন রাত পোহালেই উৎসব তখন এই সুযোগে ভাস্করকে আর একবার

চোখের দেখা দেখেই চলে যাবে। সে উৎসবে প্রতিবছর যেত, আশ্রমের অনেকে তার চেনা।

কাল আঁধার ঘরেও সনাতন যেন স্পষ্ট দেখেছিল, আজ ভগ্নস্বাস্থ্য দাদাবাবু সভায় পৌঁছলে সভার প্রত্যেকটা দৃষ্টি তাকে দেখে কি-ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মালা পরতেই বা তার কি সলজ্জ আপত্তি! কোনদিনই ওসব সে পছন্দ করে না। অবশেষে সারাবুক মালায় ঢেকে, সভাসুদ্ধের হাততালির মধ্যে তার দাদাবাবু ধীরে ধীরে আসনে বসল— এই একান্ত নিশ্চিত দৃশ্যে তার চোখে যেন জল এসেছিল।

আজ গোপনে সে সভায় এসেছিল এবং একান্তে বসে একটা চকিত আশায় সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু উৎসুক চোখে চেয়ে চেয়ে চোখ ফেটে জল এলেও সে এখন পর্যন্ত ভাস্করকে আসতে দেখেনি।

ভূতনাথ তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল—'এসেছ? কিন্তু পিছনে বসে যে?' সে আজ হেড-দপ্তরীর নিদর্শনস্বরূপ উৎসবের মালা নিজের হাতেই গলায় পরে নিয়েছিল।

সনাতন না ফিরে বলল—'চুপ, চেঁচায় না।'

ভূতনাথ বিস্মিত হয়ে কাছে চলে এল—'চেঁচায় না! কেন, কি হয়েছে—ওকি তুমি কাঁদছ নাকি?'

কাঁদার উল্লেখে সনাতনের হুঁশ হোল। সে ফিরে বসে হাসবার ভান করল—'আরে না না, কাঁদব কেন—কোন দুঃখে। বয়স হয়েছে না? একদিষ্টে তাকিয়ে থাকলে চোখ কেমন জলে ভরে আসে।' এবার তার চোখ দিয়ে প্রকাশ্যেই দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। ভাস্করের আসার আশা সে যেন আর রাখতে পারছিল না।

ভূতনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে খোদ অফিসের লোক, ভাস্করের নিমন্ত্রণ না যাবার সংবাদ জানত। সে সনাতনের বলা

চোখের জলের কারণও যেমন বিশ্বাস করল না, তেমন আর ব্যথার স্থানে নাড়াও দিল না। বলল—'তা তুমি পিছনে কেন। চলো চলো, আগে বসবে—ভাল জায়গা দেব।'

'আর থাক, আবার ঠেলাঠেলি।' সনাতন ভয় করল, সে আগে গেলে ভাস্কর এসে দেখে ফেলবে।

'ঠেলাঠেলি!' ভূতনাথ সহাস্যে তার বাহুর ব্যাজ দেখিয়ে বলল—'আজ সেইকাজই তো আমারে, চলো চলো।'

'উঁহু, বেশ আছি। সভা তো এখনই আরম্ভ হবে কেমন?'

'হ্যাঁ।' অগত্যা ভূতনাথ সদয় মনে পকেট থেকে কলাপাতায় মোড়া একখিলি পান দিয়ে তাকে খাতির করল।

সনাতন চিবোতে পারে না, তবু হাত পেতে পান নিল। বলল—'উৎসবের দিন। বাবু-ভায়াদের সাজতে গুজতে সময় লাগে, কি বলো? আমাদের কি! হুকুম হোল—যাও, পরে আসছি—আগেই চলে এলাম।'

'কে, কার হুকুম হোল?'

'দাদাবাবুর। কিন্তু বড় যেন দেরি করছেন, নয়?'

ভূতনাথ বিস্মিত হয়ে তাকাল, কিন্তু গেটের দিকে সোরগোল উঠায় দ্রুত চলে গেল। সে আবার ভলান্টিয়ার!

সনাতনও উৎসুক হয়ে গেটের দিকে তাকাল। কিন্তু যা দেখতে পেল তাতে সে চমকে উঠল—খুকি!

একা খুকি নয়। তার পিছন পিছন যে তরুণটি সারিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকদের সামনে দিয়ে সভায় আসছে, সনাতন তাকেও চিনল। এতদিনে ওদের সম্পর্ক তবে স্থির হয়ে গেছে। তার অন্তরাত্মা যেন কেঁদে উঠল—ভগবান!

মমতাও বিস্মিত বড় কম হোল না, যখন সে দেখতে পেল উদয় তাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল না। পরন্তু সে পূর্ণকলস আম্র-পল্লব সুশোভিত দ্বারের দিকে এগিয়ে এলে স্বয়ং যতীবন্ধু আশ্রমের আরও কয়েকজনের সঙ্গে একরকম ছুটেই তার দিকে অগ্রসর হলেন—'স্বাগতম্ সুস্বাগতম!'

মমতার সমস্ত অন্তর অশুভ শঙ্কায় দুলে উঠল।

যতীবন্ধু উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'অদ্য আমাদের পরম ভাগ্য। না না, ওই মাল্য আপনাকে পরতেই হবে, কিছুতে শুনছি নে।' যতীবন্ধু আগ্রহবশে ক্রিয়াপদেও সাধু চালাতে উদ্যোগী হলেন।

মমতা ভয় পেয়ে গেল। একে তো উদয়ের সর্বত্রগামী কূটজাল তাকে কখন যে কোথায় বাঁধবে তা নিয়ে তার স্বস্তি ছিল না। তারপর, দীর্ঘকাল পরে এখন যাঁর সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে—এই মুহূর্তে ওই লোকটির উপস্থিতি সে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

যতীবন্ধু অভিনন্দন পাঠের মতো বলতে লাগলেন—'লোকে জানুক, সেই দুর্দিনে একমাত্র কাহার দানে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান টিকিয়াছিল। অথচ অনুরোধসত্ত্বেও অহমিকা হইবে বলিয়া ইনি নিজের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি পর্যন্ত দেন নাই।'

উদয় অস্ফুটস্বরে আজও বোধ হয় নিষেধই করল, কিন্তু যতীবন্ধু বলতে লাগলেন—'পরিতাপের বিষয় আপনার পশ্চিম হইতে রওনা হইবার সংবাদ আমরা বিলম্বে পাইয়াছি। তাই সম্বর্ধনার আয়োজন করিতে পারি নাই। এখন নিজগুণে প্রধান অতিথির আসন আপনাকে লইতে হইবে।'

উদয় কুণ্ঠিত হচ্ছিল, বলল—'কিন্তু কিছু আগে ছেড়ে দিতে হবে।'

'অবশ্য অবশ্য।'

মমতার মুখে রক্তের চিহ্ন নেই, মুখ একেবারে সাদা। মেয়েদের নির্দিষ্ট স্থানটি পূর্বেই পূর্ণ হয়ে গেছে। সে তার মধ্যে কোথায় নিজেকে গুঁজে দেবে মুহ্যমান চিত্তে সহসা বুঝতে পারল না।

ঊর্মিলা তাকে বাঁচাল। সে উপবিষ্টাদের মধ্যে বসে সবই দেখছিল, এসে হাত চেপে ধরল—'আয়, বসবি।'

মমতাকে বসিয়ে দিয়ে সেও যখন পাশে বসল, তখন প্রধান-অতিথির ন গ্রহণে ঘন ঘন হাততালিতে সভাস্থল কম্পিত হচ্ছে। মমতা য়ের জন্য সতৃষ্ণ চোখে শিক্ষকদের আসনগুলো খুঁজে এল। কিন্তু থায় তিনি? তার মুখ শুকিয়ে গেল।

করধ্বনি থেমে আসলে ঊর্মিলা বলল—'চিঠি পেয়েছিলি?' মমতা নাড়াল। ঊর্মিলা বলল—'নানাজনে নানাসংবাদ দিতে লাগল, চিঠি দিলাম।'

মমতাকে অন্যমনস্ক দেখাতে লাগল। ঊর্মিলা কানে কানে জিজ্ঞাসা —'ভাগ্যবানটি কে? মালা যিনি পরলেন, না যিনি পরালেন?'

মমতা ঊর্মিলার দিকে তাকাল। একটি সুদর্শন তরুণ এতক্ষণ ন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে উদয়ের অভ্যর্থনায় উৎসাহ দেখাচ্ছিল, সেই এখন ন-অতিথিকে মালাও পরিয়েছিল। কিন্তু মমতার এ-সব দিকে নজর না।

ঊর্মিলা বলল—'বললি নে?'

জানিনে তো।' মমতার কণ্ঠস্বরে অজ্ঞতা ফুটে বেরোল।

ঊর্মিলা ধাঁধায় পড়ল, বলল—'তা বই কি! একজনের যে সঙ্গে দেখতেই পেলাম, বাকী সংবাদ আগেই শুনেছি। আর একজন নেছি ওঁরই কোন আত্মীয়—শিল্পের নতুন মাস্টার, কিন্তু কিছুই জান না, কেমন?'

'শিল্পের নতুন মাস্টার!' মমতা অস্ফুটে বলল। তার যেন ম
ছিল না, একজন বিদায় নিলে অন্যে এসে তার স্থান পূর্ণ করে বসে।

উর্মিলার মন থেকে নানাকথা শুনে শুনে কিছুদিনের বুনে তোলা
পর্দাখানা খসে যাচ্ছিল। একমাত্র সে-ই এ আশ্রমে ভাস্কর-মমতা
সুদীর্ঘ প্রণয়-ইতিহাস জানত। তাই নিম্নকণ্ঠে সহানুভূতি দিয়ে বলল—
'কি করবে ভাই। ভাস্করবাবু আজ যদি প্রদর্শনীর পুরস্কারট
পেতেন! ওই যতীবন্ধু তা থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন। আশ্র
মারফত মূর্তি গিয়েছিল বলে টাকাটাও আশ্রমে এসেছিল। কিন্তু উ
আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন—দুঃখিত, এর শিল্পী এখা
নেই।'

সুমুখের লোকজন সমাবেশ সমস্তই মমতার চোখে লেপে মু
একাকার হতে লাগল। সে কথা বলল না।

উর্মিলা ক্ষুব্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'যতীবন্ধুও এত ছিল
না। দিন দিন যে কার পরামর্শে ওঁর এমন মতি হচ্ছে! ...কিন্তু য
বলিস, সত্যি রাজপুত্রের মতো দেখতে।'

মমতা চমকে বলল—'কে?'

'কেন, আমাদের প্রধান-অতিথি!'

মমতা মুখ নামিয়ে নিল। সভার সবই যথানিয়মে চলতে লাগ
কেবল নতুন মাস্টারকে সর্বসমক্ষে চিনিয়ে দেবার পর, প্রচণ্ড করধ্বনি
মধ্যে তিনি যখন আসনে বসলেন মমতা একবার চেয়েছিল, তার
আর মুখ তুলল না।

সনাতন আত্মহারা হয়ে উঠল। দেখতে পেল, কে একজন অপরি
ভাস্করের আসন জুড়ে বসছে। শুধু তাই নয়। উদয়েরও আজ
আসন। সভাস্থ কেউ যে কোনদিন তার দাদাবাবুকে চিনত তা

রঞ্জিত চোখ মুখ দেখে তেমন মনেও হোল না। সে চোখের জল প্রাণপণে চেপে রেখে উঠে দাঁড়াল।

মেয়েদের বসবার দিকটায় ভিড় কিছু কম। সে সেইপথেই গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

ভূতনাথ তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল---'চলে যাচ্ছ? দেরি করলে খেয়ে যেতে পারতে—এবার বেড়ে ব্যবস্থা হয়েছিল।'

'হতে দাও।'

'কেন, হতে দাও কেন?'

সনাতন আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল—'মেঘ আসছে। দুপুরের আগেই এবার বৈশাখী। বুড়োমানুষ—এখন যাই।'

'মেঘ!' ভূতনাথ হেসে উঠল—'চারদিকে খাঁ-খাঁ করছে রোদ তুমি বলছ মেঘ!'

বস্তুত কাল রাত্রের ঝড়-ঝাপটার পরে আজ নীল আকাশ রোদে পুড়ছিল। কিন্তু সনাতন বারবার করে তাকিয়ে দেখল—চারদিকে মেঘই দেখল শুধু।

আশ্রমের সীমানা পার হতে যখন বাকী বড় নেই, সনাতন শুনতে পেল তার নাম ধরে কে পিছন থেকে ডাকতে ডাকতে অতিদ্রুত হেঁটে আসছে। গলা শুনেই চিনেছিল, সে নিমেষে মুখ ঘুরিয়ে আরও জোরে হাঁটতে লাগল। মমতা প্রায় ছুটে এসে পথ আটকাল—'সনাতন!'

বৃদ্ধ তবু পাশ কাটাতে গেল।

'সনাতন!'

'আর কেন, তোমার বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে।'

মমতা অত্যন্ত কাছে এসে বলল—'এই কি মান-অভিমানের সময়, তার কি হয়েছে বুড়ো?'

এই সম্বোধনে বৃদ্ধের যেন ধৈর্যের বাঁধ টলতে লাগল। সে মমতার চোখের দিকে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল, কোন জবাব দিল না।

'আমাকে বলো। অসুস্থ বেশী হয়েছেন?'

'ইদানীং সুস্থ তো তিনি কোনদিন ন'ন।'

'তবে?'

সনাতন চুপ করে রইল।

'আজ যে মাস্টারমশায়ের মূর্তি নেবার কথা ছিল, কি হয়েছে বুড়ো?'

বারংবার ডাক শুনে সনাতন একমুহূর্ত শক্ত হয়ে রইল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল—'আমি তো আর সেখানে থাকিনে।'

মমতা যেন ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে এল, 'উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল—'থাক না সেখানে! তুমি আর সেখানে থাক না! আমি যাই।' বলেই স্টুডিয়ো মুখো পথ ধরে অতিদ্রুত হাঁটতে লাগল।

সনাতনও পিছন পিছন হনহন করে এগোতে চাইল, কিন্তু যত রাজ্যের মেঘ এসে তার পথ আটকাচ্ছে—কালো কালো মেঘ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। অগত্যা বিরক্ত হয়ে মেঠোপথেই পাড়ি ধরল সে, মাঠ দিয়ে সোজাও হবে।

২৫

ভাস্কর কাল ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় এবং নাকের রক্তে ভিজে ওঠা আস্তিন-কোঁচা নিয়ে কতকটা আচ্ছন্নের মতো লালকুটি থেকে ফিরেছিল। এসে বিছানা নিল। সমস্ত বিকাল গেল, সন্ধ্যা হোল, সে উঠতে পারল না।

অবসন্নভাবটা কেটে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য যে—যেকথার আর প্রয়োজন ছিল না, যার সঙ্গে এ-জীবনের সম্বন্ধ যেন শেষ হয়েছে ভেবেছিল, নির্জীবের মতো শুয়ে শুয়ে কেবল তার কথাই মনে আসতে লাগল। মমতার কথা। চিত্তে কোন কামনা ছিল না, কোন প্রশ্ন ছিল না—এতদিনে তার কি হয়েছে, কেমন আছে, কোন কথা নয়। কেবল মনে পড়তে লাগল।

বাইরে তখন বেলা শেষ হোল, সূর্য অস্তে গেল, সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া চারদিক দখল করে ঘরের মধ্যে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে লাগল কিন্তু তার কক্ষে আর আলো জ্বলল না। রাত বেশী হলেও খাবার জন্যে কেউ তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে ঠেলে তুলল না। চারদিকে নিস্তব্ধ আঁধার, শূন্য পুরী, আর সেই ঝাউয়ের শোঁ-শোঁ। জঙ্গলে জঙ্গলে গুমট একটা রুদ্ধশ্বাস ভাব, তারপর পুরানো বাড়ির ফুট-ফাট হাজার রকমের অদ্ভুত শব্দ তার স্তিমিত চেতনার পর বিভীষিকা ছড়াতে লাগল।

ভাস্কর ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করল না। ওঠার শক্তি ছিল না। একটা অস্পষ্ট আশাও সে ছাড়তে পারল না যে, রাত বেশী হলে আস্তানাহীন সনাতন যদি ফিরে আসে! যদি তখন সে ডাকলে সাড়া না পেয়ে ফিরে চলে যায়!

কিন্তু সময়টা বৈশাখমাস। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দমকা বাতাস ছেড়ে দিয়ে ঝড় উঠল। সেটা এমন আকস্মিক যে মনে হোল যেন কারণহীন অলীক কিংবা ভৌতিক কিছু। তখন সেই সব জানলা-দরজার খোলা কপাট অতিথিদের অভ্যর্থনা নিয়ে এমন মাতামাতি সুরু করল যা মোটেই সভ্যতাসূচক নয়, মৃদুমন্দ তো নয়ই। আজ প্রথম সেই দৈত্যাকার পুরীর মধ্যে ভাস্কর একলা প্রাণী। রাত যত বাড়তে লাগল, যতই ঝোড়ো বাতাস

ঢুকে পড়ে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটতে লাগল ততই যেন ফটো পড়া, ঝাড় ওলটানো, নানা জিনিস সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার শব্দে পুরীময় দক্ষযজ্ঞ চলতে লাগল। অশরীরী কারা যেন সুমুখে যা-কিছু পাচ্ছে টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করছে—ওরে ভগ্ন, ওরে প্রাচীন, আয় আমাদের মধ্যে এসে মুছে যা, এই ভাঙা খাঁচা আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ!

বারংবার শিউরে উঠেও ভাস্কর তেমন আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল। সে কোন প্রকারেই উঠে গিয়ে দরজা দেবার উৎসাহ পেল না। শরীর দুর্বল, তাছাড়া বিছানা ছেড়ে এগোতে গেলেই আকারহীন কাদের যেন ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়ে যাবে।

তার তখনকার মতো মনে হয়েছিল, মাঠের বুকের এই পুরীই যেন ঊর্ধ্বলোকের লক্ষ্য। যেন কুপিত ঊর্ধ্বপুরুষরা অক্ষম সন্তানের সকল গ্লানিসমেত একে উপড়ে নির্মূল করে দিতেই উপর থেকে নিঃশ্বাসের পর নিঃশ্বাসের প্রকোপ পাঠাচ্ছেন। এই ধ্বংসশীল আবাসের পর তাঁদের আর কোন মমতা নেই।

দুর্যোগ থামল কেবল শেষ রাতে, তখন ভাস্করও ভোরের হাওয়ায় প্রশমন পেয়ে অল্পে অল্পে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চারদিক রোদে ভরে গেছে, বেলা প্রায় দুপুর। ভাস্কর তখনও বিছানা আঁকড়ে নির্জীবের মতো পড়েছিল। ঘুম ভাঙলেও সে উঠতে পারেনি। কাল অতবড় রক্তপাত গেছে, তারপর চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল জলটুকও পেটে যায়নি। আচ্ছন্ন কানে শুনতে পেল, কে যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে—'একি, জানলা-দরজা খোলা, জিনিসপত্র ছড়া-ছড়ি, কোথায় গেলেন সব! ও মশাই!'

ভাস্কর একবার ওঠার চেষ্টা করে আবার তেমনি পড়ে রইল।

কিন্তু যে ডেকেছিল সে রমাকান্ত। যাবার পাত্র নয়। ঘরের

দিকে আসতে আসতে আবার ডাকল—'জেগে জেগেই ঘুমোচ্ছেন নাকি। তা সে ফিকির মন্দ নয়। সনাতন, ও সনাতন!'

ভাস্কর চোখ রগড়ে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে উঠে বসল, মনে পড়ল—সনাতন তো নেই।

রমাকান্ত দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলল—'এই যে মশাই ভাস্করবাবু তবু ভাল। জানলা দরজা খোলা, লোক দেখিনে, ভাবলাম বুঝি দেনার বদলে বাড়ির দখলই রেখে দিয়ে চলে গেলেন।' সে রসিকতাচ্ছলে হাসতে লাগল।

ভাস্কর বালিশ কোলে চেপে সোজা হয়ে বসতে চাইল।

রমাকান্ত হেসে বলল—'তা আপনারা পারেন, যা খেয়ালী লোক!'

এই লোকটাকে দেখলে ভাস্করের চিত্ত জ্বলে যেত। কিন্তু আজ তার রক্তহীন পাংশুমুখে প্রশান্তিই ছিল। অমন বিকট রাতের পরে এই প্রথম মানুষের মুখ দেখল শুধু তাই নয়, মনে পড়ল—আজ উমানাথও মূর্তি নিতে আসবেন। বলল—'কাল টাকা পাবেন।'

'টাকা পাবেন!' রমাকান্ত গম্ভীর হয়ে গেল। দেনাদারের মুখ থেকে এ-জীবনে একথা সে অনেক শুনেছিল, বলল—'কেবল কি কথা শুনে পাওনাদার ছাড়ে মশাই! টাকা পাবেন—কোথা থেকে দেবেন শুনি?' বলে সে জীর্ণ ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলাল।

কিন্তু ভাস্করের মুখে তবু বিরক্তি এল না। বরঞ্চ আজ এক ধরনের তৃপ্তিই তার প্রকাশ পেল, যখন বলল—'অনেকদিন অনেক ওয়াদা নষ্ট হয়েছে বটে, তাবলে এবার হবে না। আজ না হয় কাল টাকা নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।'

'কোথা থেকে?'

ভাস্কর ঠোঁট কামড়াল—'যা বললাম আপনি শেঠজীকে বলবেন।'

রমাকান্ত বসেছিল, হঠাৎ ক্রোধভরে উঠে দাঁড়াল—'ও, আচ্ছা বলব। কিন্তু—আজ থাকে যেন আজই শেষ দিন।' বলে বেরিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর ধীরে ধীরে বাইরে উঠে এল। ওয়াদার আজ শেষদিনই বটে, কিন্তু আজ আর তার খেলাপ হবার শঙ্কা ছিল না। সে উষানাথের কথায় কখনো নড়চড় হতে দেখেনি।

মৃদুপায়ে বারান্দায় এসে চারদিকে তাকাল। ঝড়ের রাতের পরে লণ্ডভণ্ড চেহারা—ভাঙা ডাল, ছেঁড়া পল্লব, আসবাবপত্রও উড়ে-পড়ে দশ অবস্থা। সমস্তই এক দীর্ঘরাত্রির মাতামাতির পরে যেন ক্লান্ত হয়ে ঝিমচ্ছে। ভাস্কর তার মনের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানেও এক ঝড় বয়ে গেছে। সেখানে কি যে গেছে, আর কি যে আছে—তার হিসাব নিতে ভয় হয়, পূর্ণভাবে তাকানো চলে না।

তবু সকাল চিরদিন স্বাস্থ্যময়, চিরদিনই সূর্য ওঠে নতুন আলো নিয়ে। তাই তার একদিক চলে গেলেও, আজ উষানাথের আসা, ঋণমুক্তির আশা তার অবসন্ন দেহমনকে স্বচ্ছন্দ করে রাখল। কিছুক্ষণ পরে বেশভূষা বদল করে স্টুডিয়োতে এসেও সে গভীর তৃপ্তি পেল। যে রাত চলে গেছে তার ঝড় যেন অনেক কিছু ভেঙে দলে গেছে, কিন্তু স্টুডিয়োর এই মূর্তিগুলি ছুঁতেও পারেনি। তার মাস্টারমশায়ের মূর্তি, তার ব্রঞ্জের বৃদ্ধ, তার আরও অনেক সৃষ্টি—সব যেন তার বুকের মধ্যের গভীর নিষ্ঠার মতো। নিরাপদে অটুট হয়ে আছে। সেই দেখে অবসন্ন চিত্তেও ভাস্কর সাহস পেল, এদের নিয়ে আবার তাকে দাঁড়াতে হবে।

এমন সময় দেখতে পেল অনুমানের কিছু আগেই বৃদ্ধ তেমন গুটিগুটি পায়ে উদ্যান দিয়ে এগিয়ে আসছেন। অনেকটাই চলে এসেছেন। পিছনে আরও কয়েকজন লোক, ভাস্কর বুঝল তারা বাহক।

উষানাথ এসে পৌঁছলে ভাস্করের রুগ্নমুখ স্মিতহাস্যে ভরে গেল। কষ্ট হলেও সে আনত হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

কিন্তু তার চেহারা দেখে উষানাথ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—'আমায় জানাওনি তো! কোন কঠিন পীড়া হয়েছিল?'

ভাস্কর মৃদু হেসে বলল—'সেরে গেছে। তেমন কিছু নয়।'

উষানাথ বিস্মিতের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন। বললেন—'না না—ভাস্কর, শরীরের পর যত্ন নেওয়া শরীরের ধর্ম, ধর্মকে হেলা ক'রো না।'

তিনি অনুমান করে কাপড়ে ঢাকা মূর্তির দিকেই অগ্রসর হলেন। বললেন—'তারপর? সব হয়ে গেছে?'

'এই যে দেখুন।' ভাস্কর স্মিতমুখে ঢাকনা খুলতে এগিয়ে এল। এই ক্ষণটির জন্যে সে অনেকদিনই মনে মনে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তার এই একান্ত আশার পরিসমাপ্তি যে কিভাবে ঘটতে যাচ্ছে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না।

আবরণ খোলা মূর্তির দিকে চেয়ে উষানাথ গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। বাহকরা পিছন পিছন এগিয়ে এসেছিল, সহসা তাদের বললেন—'দাঁড়া তোরা।'

কয়েকমুহূর্ত চলে গেল, উষানাথ ইতস্তত করে বললেন—'উঁহু, তোল না। ফিরে যা।'

ভাস্কর আবরণ সরিয়ে মূর্তির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল—'যা ভাবছেন ততভারী নয়, দুজনেও পারবে বয়ে নিতে।'

'তা নয়তো কি।' বাহকরা বলল—'এসেছি যখন, ফিরে যাব না।'

উষানাথের মুখ আরও গম্ভীর হোল। ভাস্করের রুগ্নমুখের দিকে চেয়ে তাঁর বলতে যেন কষ্টবোধ হোল, তবু তাঁর নিষ্ঠা কখনো

পারল না এরই একান্ত পাশে আপন ঘরের মধ্যে কারও সর্বময় তখন কোন নিস্তব্ধ দুরত্বে গিয়ে পৌঁছেছিল।

সনাতন অল্প আগে পৌঁছেছিল। ভিতর থেকে শূন্য একটা কলস নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, সারিবন্দী সোপানশ্রেণীর উপরেই তার গতি হঠাৎ থেমে গেল। দীর্ঘ-সিঁড়িময় ঝড়ে-ভাঙা শাখা-পল্লব-আসবাব পত্রের ছড়াছড়ি। সেগুলির উপর দিয়ে তার আরক্ত দৃষ্টি সোপানমূলে মমতার চোখে পড়ে যেন কেঁপে উঠে আটকে গেল। মমতারও দৃষ্টি তার উপর স্থির নিবদ্ধ, সে চিত্রাপিত প্রতিমার মতো নিশ্চল হয়ে আছে।

সনাতন চোখ নামিয়ে কলস নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল। তার পদক্ষেপের দুপদুপ শব্দ মমতা আপন বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে শুনতে পাচ্ছিল, চোখে পলক পড়ল না।

সনাতন কাছে এল। উদ্গত কান্না আটকাতে একমুহূর্ত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ডেকে উঠল—'খুকি!'

মমতা ঘুরে এসে সনাতনের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগল।

'খুকি! স্টুডিয়োতে যাও।'

'বুড়ো!'

সনাতন নিজেকে সা[illegible] নি[illegible] বলল—'জ্ঞান নেই। কপালে কি আছে জানিনে।'

মমতা তবুও কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে [illegible] রইল। মনে হোল সে যেন চীৎকার করে উঠবে, যেন যা-খুশী তাই করবে। কিন্তু কিছুই করল না, ধীরে ধীরে বলল—'ভয় কি। তুমি [illegible] এস, আমি যাচ্ছি।' তার শান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবার মধ্যে কোন সংশয় ছিল না।